কলরব

পুরুলিয়া ১৯৭১

creative commons

Collective creation of students who gathered under the sky of Ramakrishna Mission Vidyapith, Purulia during 1964-70 and shared their joys and pains

১৯৬৪-৭০ এর সময় পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের আকাশের নীচে জড়ো হওয়া ছাত্রদের একটি যৌথ সৃষ্টি, তাদের না বলা গল্পকথা, তাদের আনন্দ এবং বেদনা ভরা কলরব

কলরব

পুরুলিয়া ১৯৭১

প্রচ্ছদ চিত্র – নন্দ দুলাল মুখোপাধ্যায়
অন্যান্য চিত্র – নন্দ দুলাল মুখোপাধ্যায়
জয়ন্তকুমার ভট্টাচার্য্য
পিনাকী বরুয়া
মানস রয়
আলোক চিত্র - পিনাক চক্রবর্তী
জয়ন্ত বিশ্বাস
মলয় বসু রায়
জয়ন্তকুমার ভট্টাচার্য্য
জয় নারায়ণ সাউ
সংস্করণ - ফাল্গুনী গুহরায়
শান্তনু চ্যাটার্জী
সুব্রত ভট্টাচার্য

গ্রন্থনা ও অঙ্গসজ্জা - ফাল্গুনী গুহরায়

নভেম্বর ২০২১

সূচীপত্র

সে কি ভোলা যায়..... 5
শান্তনু চ্যাটার্জী

Prayers and blessing 9
Falguni Guharay

Vidyapith vignettes 13
Pinak Chakrabarti

A memorable journey 19
Debkumar Bonnerjee

Pinaki Barua: a friend, a realist, a legend 22
Falguni Guharay

কোলাজ 24
সুব্রত ভট্টাচার্য

আমার দ্বিতীয় দেশের খোঁজে 30
মোহিত রায়

পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে "মহিষাসুরমর্দিনী" 39
রূপক রায় চৌধুরী ও দেবকী নন্দন লাহা

আজ বেলাশেষে 44
জয়ন্ত বিশ্বাস

Goodbye, friends, Goodbye 52
Ramesh Chandra Sarma

The Saviour 58
Jay Narayan Sao

Gentle waves of memories 63
Nisith Ranjan Mandal

Forest of Billund 65
Manas Roy

স্মৃতির অতল থেকে 70
নন্দ দুলাল মুখোপাধ্যায়

অচেনা হেডমাস্টার মহারাজ 74
জয়ন্তকুমার ভট্টাচার্য্য

মন গভীরে আছে যা থাক 77
শুভময় গঙ্গোপাধ্যায়

Predicting climate: legacy of Basab 78

Photo journey of Vidyapith 80
Malay Basu Ray

The paintings 82

Vidyapith personalities 86

সে কি ভোলা যায়.....

এক ছোট্ট রেল জংশন গ্রাম, কাকডাকা ভোর, চাবি ঘোরানো টেবিল ঘড়ি ঘুম ভাঙানোর ষড়যন্ত্র। দরজায় লালজামা কুলি, কালো ট্রাঙ্ক আর দড়ি বাঁধা বেডিং, ওভার ব্রীজ পেড়িয়ে, বাষ্পটানা কু-ঝিক-ঝিক চক্রধরপুর আদ্রা হাওড়া গাড়ি বনপাহাড়ি পথ ধরে কাপ্তা কুনকি-চাণ্ডিল টামনা পেরিয়ে গন্তব্য পুরুলিয়া ইস্টিশন, দেখতাম উল্টো দিকের ফিরতি গাড়ী দেরী কিনা। কলকাতা বাহিনী এসে গেলে হোস্টেলে জানলার ধারের বেড পাব না, রিক্সা চলত, বাজারে হল্ট, গরম নিকূতি আর চা, নালা শশ্মান, পলিটেকনিক, আগের সৈনিকস্কুল, বোঙাবাড়ি গ্রাম তারি গায়ে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত.....'প্রবেশদ্বার, বিবেকানন্দ নগর।

আমগাছতলার বেদী,অফিস, বড় মহারাজের আবাস, অতিথিশালা, সঙ্গীত আর শিল্পকলা গৃহ, সারদা মন্দিরের পাশ দিয়ে কালীপদদার অফিস আর মুখোমুখি পাশাপাশি চার দোতলা বাড়ি, প্রথম সাধু মহারাজদের নামাঙ্কিত আটটি ধাম।

খেলার মাঠ ঘুমভাঙানিয়া ঘন্টা, কোণে প্রবালের ডাক্তার দাদু, মৌচাক শিশু পত্রিকার রবিদা কম্পাউন্ডার, অবনী ড্রেসার, ইঁদারা ঘর আর বড় দের চার নং হোস্টেল। পাশে পরে হওয়া লাইব্রেরী, খাওয়ার ঘর, পিতলের ঘন্টা, কাঠের হাতুড়ি, মাঝিদা, মহাদেবদা, ব্রহ্মার্পণম্, জয় দিন ।

মেরি-গো-রাউন্ড, ল্যাডার, গন্ধমাদন নিয়ে হনুমান,লাঠি ক্লাবস লেজিম,ভলি, হকি ক্রিকেট ফুটবল সুশীল দা ,মিহির দা, সর্দারজীর জিমনাশিয়াম । পেছনে পুকুর পাশে, পরে হওয়া শিবানন্দ সদন ছোটদের। সারদা মন্দিরের দোতলার কোনে ষষ্ঠ শ্রেণী শেষে রামদার কাছে আঁকা শেখা, রং আর তুলি ধরা, সকাল সন্ধ্যা ঘড়ি ঘন্টা বাঁধা জীবন, বুধবার হাফ আর টিফিনে অধিকারী চানাচুর, ডার্করুম দুপুর।

রবিবার বিবেকানন্দ ব্রিগেডের দীর্ঘ প্যারেড। ড্রাম বিউগল ফ্লুট ট্রালা ট্রালা ব্যান্ড। দৌড়ে এসে খিচুড়ি পাঁপড়। স্পেশাল ভজন , নাচে পাগলা ভোলা, শিবরাত্রির নন্দ মহাদেবের নন্দীভৃঙ্গী জয়ন্ত প্রদীপের উদ্দাম নৃত্য ও মহাধ্যান।

নতুন পাঠশালা বিবেকমন্দির, রবিবারের ম্যাচ অরুণাভ আর মলয়ের ওপেনিং অনিল হাম্মার বিরুদ্ধে। জবাবে সৌম্যর স্পিন, তপোর সুইং, শুভ আম্পায়ার। আর ফুটবলে নন্দ গোলকি, বিভাস ব্যাক, আফ্রিকা ফেরত সুরঞ্জনের মাঠ কাঁপানো সবুজ আর মেরুণ জার্সি। দীপক পালের 100, 200 স্প্রিন্ট, পিণাকী আর অশোক সাহার হাইজাম্প, কালীপদদার ভলিবলে হুঙ্কার।

আর 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' মিউজিক্যাল ড্রয়িং, নন্দ পিণাকীর জয় জয়কার, দড়ি টানাটানি সত্য দড়িপা আর নন্দ বিপরীত খুঁটি, সৈনিক স্কুলে ম্যাচ , ইকোড় পতোড়ার সাথে উদ্দাম নাচ। পাঁচ কিমি হাঁটা। জন্মাষ্টমী সজলের গীতাপাঠ, নন্দ পিণাকীর ছবি আর 'শহীদ' দেয়াল পত্রিকা গোসুর মুক্তো হাতের লেখা।

দুর্গাদার শব্দরূপ, শিবুদার জ্যামিতি, পরিমলদার গল্প, সুশীলদার ইংরেজি আর বাংলা ব্যাকরণ, পেরুমলদার অঙ্ক, দিলীপদা ফণীদার বাংলা, সাহেব স্যায়ডারের প্রজাপতি সংগ্রহ, ভেড়ার ফুসফুস পচা মাংসের ব্যক্টেরিয়া, শিক্ষকদের আরো কত কত অজস্র সান্নিধ্য।

টাটানগর, বাঁকুড়া, জয়রামবাটি, কামারপুকুর, রাজরাপ্পা, হাজারিবাগ অরণ্যবাস আর অভিশপ্ত পাঞ্চেত পর্যটন। শুভ আর তাপসের প্যারডি, শ্যামার গানের মুকুট, প্রদীপের আবৃত্তি আর উত্তরায়ণ মোহিতের চন্দ্রাভিযানের বঙ্গবিজয়।

হ্যালির ধূমকেতু, পাক ভারত যুদ্ধের নাইট কারফিউ, পুরুলিয়া শহরে অ্যান্টনি কবিয়াল সবিতাব্রতর সৌদামিনী আমি তোমাকে ভালোবাসি। আর বাইসাইকেল থীফ, মায়া ,রামমোহন, পূজারিণী .....চলচ্চিত্র। নন্দ নেতাজী, উত্তরায়ণ একলব্য, মোহিত ভুপেন তলাপাত্র, আর মানস লেনিন।

হিরণ্ময়ানন্দজীর গভীর ভাষণ, কালীপদ দার স্নেহচ্ছায়া, চন্দনদার সহজ আন্তরিকতা, রামানন্দ মহারাজের কঠোর শাসন, সে এক অভূতপূর্ব ছাত্রবেলা। পিটারদার কারখানা, কেষ্টদার কাঠশালা, আম্রপল্লীতে দোলের আবির, দেওয়ালিতে বাজি পোড়ানো, আয়না ছাড়া চুলের ছাঁট, খামার বাড়ির কালাপাহাড়, দূরে গুরুপল্লী। মানসের ঘড়ি চুরি যাওয়া, তন্নতন্ন বিফল সার্চ, মোহিতের গল্পপাঠ 'কে চোর '? নিমাই দার ঘরে ছায়াছবির গান। লঘু পাপে গুরুদণ্ড ধর্মাধিকরণ।

সরোজ ঋষভ ধৈবতে কড়ি ও কোমলে স্বরবিতান সেই বিদ্যাপীঠের তরুলতার দোতারার তার অতর্কিতে ছিন্ন হোল কঠিন আর্তনাদে। সেই দূঃসময়ে ছিটকে গেলাম পরস্পর, বাষ্পরেল থেকে উড়োজাহাজ, রেডিও থেকে অন্তর্জাল মোবাইল, অনেক পথ কিন্তু যেন কয়েক নিমেষ।

কেউ শিরোনামের শিখরে কৃষিবিজ্ঞানে, রসায়নে, নৌবিদ্যায়,পথনির্মাণে, কলাশিল্পে, পরিবেশ সংরক্ষণে। আর আমি এখনও সেই বাষ্পটানা ইঞ্জিনের নিষ্ক্রমণ শুনি । শান্ত গোধূলির পুরবী আলোয় মনে পড়ে সকালের ফিরোজা শৈশবের পাঠ, কানে ভেসে আসে তুলসী দার পাখোয়াজ, নন্দর গঙ আর সমবেত মন্দ্রিত আরত্রিক ভজন মিশ্র কল্যাণে খণ্ডন ভব বন্ধন জগ বন্দন বন্দি তোমায়।

আমার এই সামান্য বিদ্যাপীঠের ছাত্রবেলার ছিন্ন স্মৃতির স্তবক অশোক পারিদা, জ্ঞানেশ্বর সিং, বাসব বন্দোপাধ্যায় ও পিণাকী বড়ুয়াকে উৎসর্গ করলাম। সবাইকে এই শরতে আমার ভালোবাসা ।

শান্তনু চ্যাটার্জী

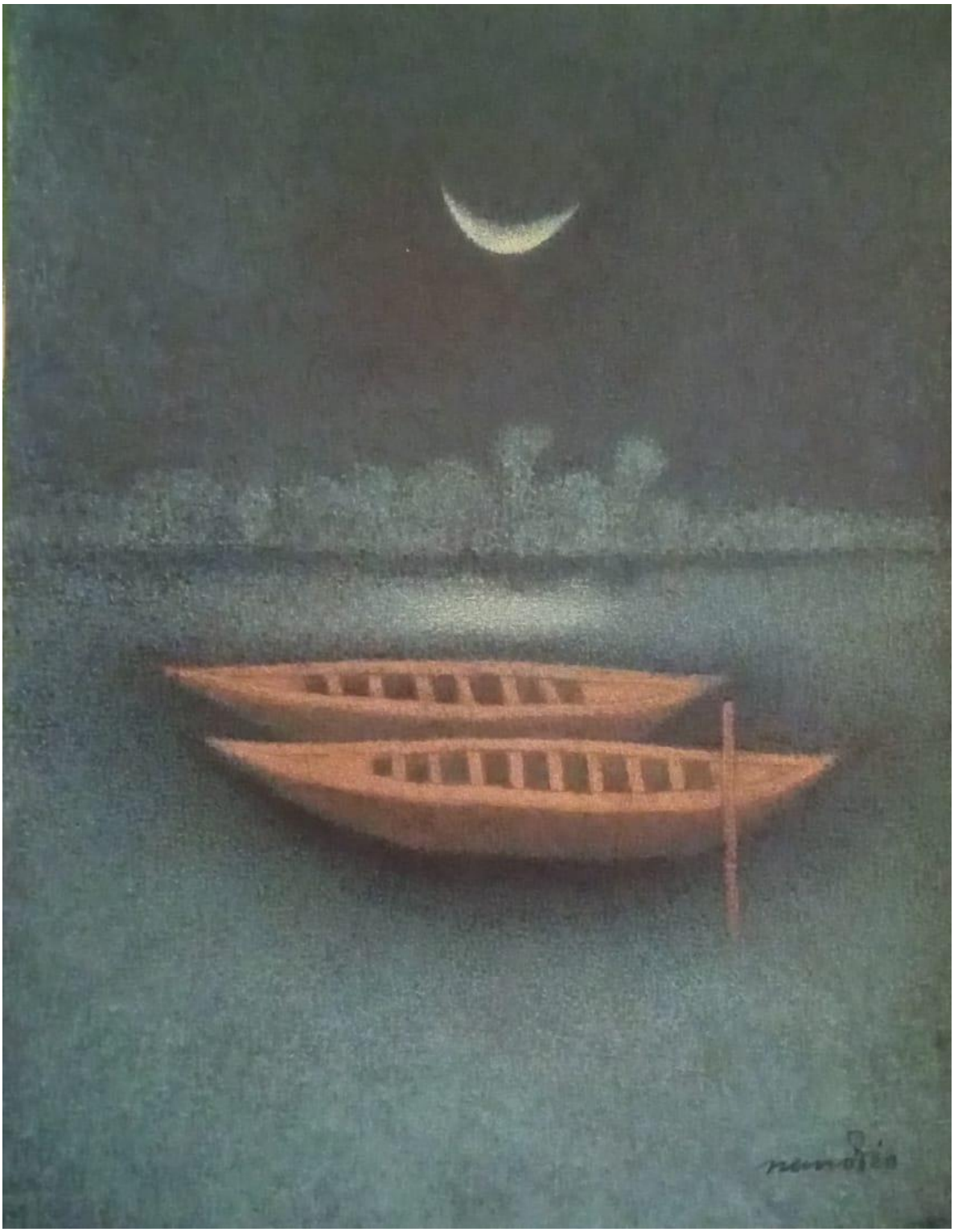

Prayers and blessings

It was one of the late winter months or early spring of 1965. A woman from Kolkata woke up early in the guest house of Purulia Ramakrishna Mission Vidyapith. She was the Social Organizing Commissioner of Bharat Scouts and Guides on her trip to visit Girl Guides troops in the tribal areas. She usually would overnight at the PWD bungalow, but a big delegation of Ministers was in town. So, she was squeezed out, and had to take a Rikshaw and come to RKMV, looking for a place to sleep.

They say every cloud has a silver lining, and she found hers that winter morning. As she was about to dip her Britannia biscuit in the over-sweetened milk tea, she heard the chirping of the distant voices of the children in white uniform moving like dream figures in the dew-clad green fields guided by their happiness and strict commands of Sardarji. *Ki sundor lagchee, ekhane eto chele, sobai porte ashee?* She asked the attendant with a turban. *Hai, pray 400 chele ache amader missione, sobai pora sunoi khub bhalo, ekhanei thake aar ekhaney pore. Oneker bari Kolkatay aar oneke abar ashe Dhanbad theke*. He introduced the panorama of the school to the woman briefly.

As she was getting dressed in her Girl Guides uniform of navy-blue silk saree, white blouse with collar, her badges, her belt and the Nepali dagger, she could not stop daydreaming about her two boys studying in this beautiful school. She walked out of the guest house and noticed a senior monk clad in his saffron-colored tunic walking towards the administrative office. She approached him and touched his feet as a show of respect. He looked at her, a bit puzzled by her uniform and asked, *Aapni to Guide er Commissioner, ekhane apnar thik moto jotno hoyechhee to*?

She expressed her gratitude for the kind attention and asked him directly *Amaar dui chhele, amar khub ichha ora ei skule pore boro hok. Kintu ami bhavchchi, dujoner khoroch to onek hobe, amra parboki.* He politely asked her if she had few minutes to spare and invited her to come to the office. As she entered the office, she noticed his name on the door, Swami Hironmayananda. He asked her to sit down and asked about the family's employment status and then handed her an application form of National Merit Scholarship offered by Government of India. He said, *Jodi apnar chhele ei scholarship pay, tahole or jonno apnar kono khoroch lagbena.*

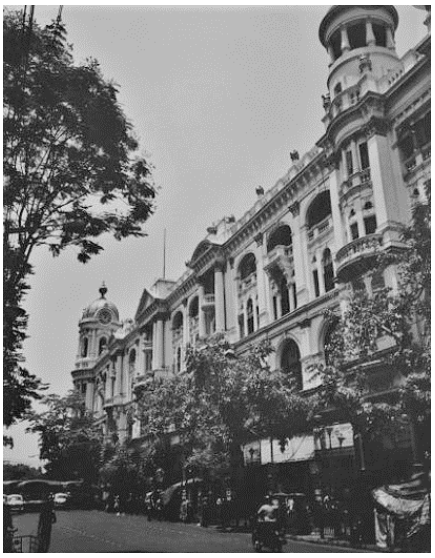

On her way back to Kolkata, her mind was busy building the roadmap for her son to get the award, filling the application, getting it endorsed by the current school, preparing him to sit in the written examination and the interview. As she reached her home, she cleaned herself, changed her clothes, went straight to her small temple to submit the application form to her gods and goddesses and prayed that they illuminate her path so that her children could study in that dream school. As her emotion took over her, a drop of her tear fell on the application, precisely on the spot, that said, parent's signature.

The applications were duly filled in with attached affidavits and certificates and submitted to the clerks in the busy offices of the Writers Building. Then, one afternoon, the postman brought a registered letter with admit card for the written examination. Once the examination results were announced, the same postman brought another registered letter with the invitation for an interview. This time, he was asked to sit down and was offered a plate of sweets and cold water from the clay cistern. Then in the evening, the news was shared with the family, and the letter was kept in the temple for the Gods to bless it.

The day before the interview, she took him to her office so that he could spend the day studying there. But for the 9-year-old boy, the Guide office had another more significant attraction, the lift. The lift was run by the liftman, Muhammad. He will diligently open the gates to let folks in, move the lever to the indicated floor to activate the motor and cable mechanism, and as it reaches the desired floor, open the gates again to let the folks out with a bow of his head. As the boy travelled up and down in the lift, he told Muhammad *Kalnaa hamare ek bohut bara interview hay, Bhawan kare achhi ho jai.*

Just before lunch, a big meeting was adjourned in the office, and the boy was asked to go and touch the feet of all the senior aunties so that they could bless him. One of the aunties, Mrs. Bibha Mukerjee, called Muhammad, gave him some money and said, *chotasaab ke liye ek cold drink our ek cake leke aao, jaldi jaldi*. As Muhammad went out to fetch the treats, the boy sat at the office entrance in the stool of the liftman and waited for him to return. Finally, Muhammad came back, but he did not carry any cake or cold drinks, just an odd-looking package in his hand.

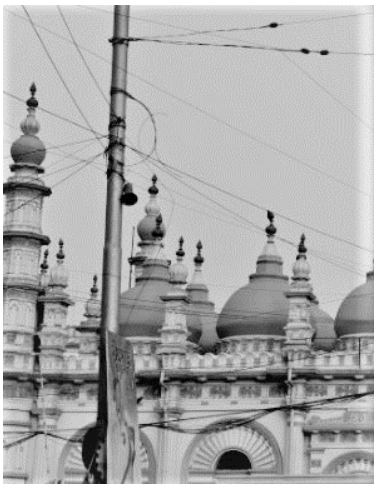

The ChotaaSaab was very upset, went to his mother's office and stood behind her chair to hide his tears, ready to flood his face. Muhammad was summoned to explain what happened, and he told in a very calm voice, *Didi job ham cake aur cold drinks khoridne ke liye jaa rahete, mujhko aajan sunai diya, aur chotassab de duya ke liye ham masjid chale gaye. Namaj ke bad job bahar aye, mey dekha que ek aadmi bohut kitab bik raha tha, mey socha ek kitab khoridle, ohi kitab sehi Alla ka duya lag jayga aur chotasaabke kaal bohut achhi kaam ho jayga.*

It was a strange explanation, but Muhammad was standing with his head down, extending his divine faith in the form of the package of the odd-shaped book. Hence, the boy accepted the reality and received the book bowing his head and uttering *Inshaaalla*. It was late, and soon the woman and the boy left the office, took a taxi to Esplanade, then boarded an empty Bus number 34 that would drop them close to their home. When he reached home, he took off the package cover and saw a used copy of the Indian Agricultural Handbook of 1963. As he opened the book, the middle two pages revealed a colored photograph of a tractor.

When his father arrived home from the office that night, the boy told him about the fantastic gift from Muhammad and showed him the photo of the machine, which looked like a road-roller. His father collaborated with the Japanese and Germans to start manufacturing heavy-duty Army trucks in India. He also knew a lot about tractors and explained that a tractor tills the land, sows seed, applies fertilizer, and harvests crops. With tractors, India can improve its agricultural production to prevent hunger and food crisis. The boy listened to him and imagined how wonderful that would be.

The next day, he sat in front of 7 older men for his interview in the Hindu School. One of the men asked, *boro hoye tumi ki hote chao*? Since he had his sense, everyone told him that he would be a doctor and his brother would be an engineer. But at that crucial moment, he ignored all that peer pressure and declared *Ami bore hoye Krishi Mantri hobo*. The answer shook the panel, and one of them asked *what you would do as agriculture minister to prevent hunger in India?* The boy remembered Muhammad, the book and the colored picture in the middle. Then he delivered an articulate and passionate description of how India will be saved from food scarcity by modern agriculture and the tractor, no doubt borrowing all the words of his father that he could remember.

A few weeks later, the postman revisited the house to deliver another registered letter, this time with the news of the selection of the boy for the Government of India National Merit Scholarship for the residential schools. The school that he was designated to attend was Ramakrishna Mission Vidyapith, Purulia. Months flew by as the family made the preparations for the journey to Purulia. The monks were generous to give the other brother a Vidyapith Scholarship. Then, the day came when the woman with her husband boarded the night train with her two boys to Purulia.

Finally, she had achieved what she dreamt of on a winter morning a year back. But now that the moment of realizing the dream had arrived, she felt sad as they were leaving their boys in the boarding school so far from home. As the sun was setting, the boys touched the feet of their parents, and received their blessing on the foreheads. With tears in their eyes, they started walking towards their recently allotted rooms in the residential quarters. As they walked on the dry soil of Purulia, that will be their home for the coming years, the boy thought about the liftman, his prayers, his gift and his blessings.

Falguni Guharay

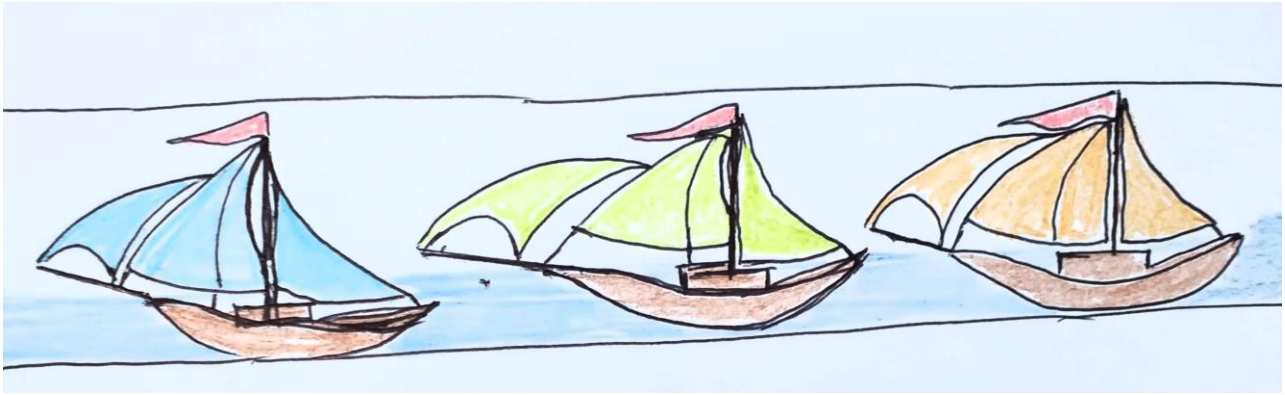

Vidyapith vignettes

ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে লিখছি। দুটো বিষয়েই আমরা অসাধারণ সব মাস্টারমশাই পেয়েছিলাম - ফনীভূষণ খাটুয়া-দা, দিলীপদা, শান্তি সিংহদা বাংলায়; শ্যামলদা, নিমাইদা, রেবতীদা ইংরেজিতে। সুশীল রায়দা দুটো বিষয়েই আমাদের বুনিয়াদ (ব্যাকরণ) শক্ত করেছিলেন।

I joined Vidyapith in the mid-session (after the summer vacation) of 1965 with a National Scholarship. Ramesh, Mohit, Uttarayan and Suranjan De joined at the same time with the same scholarship. The first encounter with my class room (VI-A) was an amazing experience. It was next to Ramda's mural at one corner of Sarada Mandir. Similar to Florence, Vidyapith was like an open-air museum. Though it could not make me into an artist, my interest in art got germinated there. In whichever city I had been to in my later life, I made it a point to visit the local museums.

We used to have one afternoon period for outing at Bedi, surrounded by mango trees. I think I developed an open, inquisitive mind from this interaction with nature. This was the basis for my career in scientific research.

There was a visiting teacher from the USA (through the Peace Crop program), Mr. Martin Brad Snyder. He used to take us for outing and I remember to have collected butterflies on such occasions. He came to India fresh from his undergraduate degree in Physics. He had shown the demonstration of a steam engine, which produced steam on butane fuel. He was always making something or the other, and Nisith Mandal got inspired to making radios from his guidance.

He was staying in a room close to the guest house and had a lot of biscuits in his room. There was a photo of a woman in his room. One of us inquired: Your lefty. His response: No, my sister! Apparently, he was friendly with Perumalda, who had taken him to his house in Tamil Nadu. The only time I played baseball in my life was when he was in Vidyapith.

কলাভবনে সব্যসাচীদা আমাদের রবীন্দ্রসংগীত শেখানোর ক্লাস নিতেন। এক বর্ষার দিনে, আকাশ কালো মেঘে ঢাকা, তিনি আমাদের 'মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো' গানটা শেখাচ্ছিলেন। সেটা ভাবলে এখনো আমার গায়ে শিহরণ জাগে। যদিও আমার গলা সাংঘাতিক খারাপ ছিল না, আমি পরে কি করে যেন tailoring section এ চলে গিয়েছিলাম। ক্লাস IX এ ওঠার আগে আবার একটা পছন্দের ব্যাপার এসেছিল। আমি সায়েন্স নিয়েছিলাম। আমার এখন খেয়াল নেই আমার পছন্দের জন্য বাবা-মার কোনো হাত ছিল কি না। তবে ওঁদের ইচ্ছে ছিল আমি ডাক্তার হই, সেটা আর হয়ে ওঠে নি। আমাদের ফার্স্ট বয় (সজল) আর্টস নেওয়ায় বোধয় কিছু বন্ধুদের আর্টস নেবার একটা ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে যাতে বেশি পারদর্শী সেটাই নিয়েছিল।

আমাদের অ্যাসেম্বলি শুরু হত, ওঁ সহ নাববতু; সহ নৌ ভুনক্তু, দিয়ে। তারপর হয় বিদ্যাপীঠের তরুলতা, বা জনগনমন অধিনায়ক জয় হে, হত । এর পর একজন ৫-৬ টা নিউজ আইটেম বলত। শেষে announcement।

Though I was in the English medium, I am not sure if we were good in spoken English. So, it was quite a daunting task to present the daily news at the assembly in English. I must have presented twice. Though short, those were my first experience in public speech. I recollect fondly the experience, as giving seminars has been part of my scientific career. Also, the assembly enclosure, with the carvings of অখণ্ড ভারত and the reproduction of Nandalal Bose's ভারত মাতা had an everlasting effect on my psyche. I still play on patriotic songs on August 15, January 23 or January 26. Not sure if the present generation students develop this feeling of being one with the country. The campus had two statues of Khudiram Bose and that instilled a sense of martyrdom in our mind. Much later in my life when I visited the Cellular Jail in Andaman (I guess it is named differently now, and not with one of the Bengali names who were incarcerated in the jail in large number) tears came out.

আমরা একটা খেলা খেলতাম, বিশেষ করে যখন বৃষ্টির জন্য বাইরের খেলা বন্ধ থাকত। ফল, ফুল, নদী, দেশ,পশু, পাখি। একটা বর্ণ ঠিক করে সেটা দিয়ে এই সব জিনিসের নাম লিখতে হত। কয়েক রাউন্ডের পর যে সব চেয়ে বেশি পয়েন্ট পাবে সেই বিজয়ী। ওয়ার্ডেনের কাছে আরো কিছু গেমস পাওয়া যেত - চাইনিজ চেকার্স (গুলি দিয়ে খেলতে হত), আর বোর্ডের উল্টোদিকে ড্রাফটস (ক্যারম গুটি দিয়ে খেলার); খেলার জন্য দাবার ঘুঁটি কিন্তু পাওয়া যেত না। স্কুল ছাড়ার পর, বা এখনকার বাচ্চাদের এসব খেলতে দেখি নি। একবার পিট্টু খেলতে গিয়ে সন্তোষের সাথে আমার ধাক্কা লাগে। আমার একটা চোখ ফুলে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সন্তোষ ও আরো অনেকে একটা বোর্ড গেম খেলতো – Trade; বোধয় নিজস্ব সেট দিয়ে। ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান হওয়ায় সন্তোষ এটা দারুন খেলত। ফুটবল খেলতাম। বিদ্যাপীঠ না গেলে জীবনে বুট পরে খেলা হত না। মনে পরে আমরা হোজে চোরকাঁটা লাগিয়ে ধামে ফিরতাম। তারপর হোজ থেকে সেগুলা ছাড়ানো আরেকটা খেলা ছিল।

I was in the Subhash Platoon. We used to stand in accordance to our height. I must have been on the shorter side to start with and had to stand near the front of the formation. May be because of this at the drill show where there was a display of a pyramid formation, I was the one to be at the top of four-tier structure. Must have done for two years. Maybe I had grown taller to fit into this role in subsequent years.

মনে পড়ে পরীক্ষার আগে চিৎকার করে পড়ার একটা প্রবণতা আসতো। ৩ নম্বর ধামের স্টাডি হলের পাশে একটা খোলা জায়গা ছিল (যেখানে ব্যাডমিন্টন খেলা হত) I সেখানে হেঁটে জোর গলায় পড়ার পক্ষে প্রশস্ত ছিল। মনে পরে সেখানে একদিন একটা সাপ দেখা দিল। নন্দ সেটাকে ধরে বনবন করে ঘুরিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। আমার তো নন্দকে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তর ইন্দ্রনাথ লাগত - ডাকাবুকো। আমাদের ড্রিল শোতে ও গলা দিয়ে লোহার রড ব্যাঁকাতো - সুশীল ঘোষদার অনুকরণে। জ্বলন্ত রিঙের মাঝখান দিয়ে ঝাপ দেওয়া, সেটাও ও করতো। অন্যদিকে সব নান্দনিক দিকেও ও পারদর্শী ছিল। জন্মাষ্টমীর সময় ও প্রচুর ছবি আঁকত, ক্লে মডেল বানাতো I জয়ন্ত বিশ্বাসও আগুনের রিঙে ঝাঁপ দেওয়ায় পারদর্শী ছিল। রোগাপটকা মানুষ, এখনো একই চেহারা। বললে হয়তো এখনো একটা লাফ দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারবে। যা চেহারা এখনো ওর পুরনো স্কুল ইউনিফর্ম ফিট করে যাবে।

I think compared to our friends from Bengal or Bihar, the students from the North-east had better shoes, in particular the pointed shoes, which Gyaneswar Singh (from Imphal) and I had. It was a source of envy for quite a few of our friends. He was the first and the only boxer that I had met intimately. Unfortunately, he left us early in February of 1969 when we had the terrible mishap at the camp site of Panchet, along with another of us Ashoke Parida (from Orissa), who was so brilliant in mathematics and had beautiful handwriting. Manabendra Sarkar also met the same fate. He was very good in playing carom.

Students from the North-east had to spend the Puja vacation in the school, as there was not enough time to go home. We had a few students from Arunachal Pradesh, and it took some of them almost two weeks to reach home. I cannot remember now if I stayed alone in the whole hostel. Was I scared? No idea. But the train journey to Assam during the other two longer vacations made man out of each one of the youngsters – with a trunk full of books, changing train at Asansol, Mokama and then Barauni (which used to be freezing in winter). But the ride in Assam Mail (which had twice the length of any other train, which allowed us to see both ends of the train, when it was going through a curve), passing through the green of Dooars and tea gardens in Assam, crossing rivers every now and then, with blue hills at a distance was something that we were lucky to experience.

স্কুলে একবার পিসি সরকার (সিনিয়র) এসেছিলেন, বোধয় সময় পেরিয়ে যাবার অনেক পর। কোনো ম্যাজিক দেখালেন না, কিন্তু বলে গেলেন কি করে ধারবাহিক ভাবে মোগল সম্রাটদের নাম মনে রাখতে হবে: বাবার হইল আবার জ্বর সারিল ঔষধে। প্রত্যেকটি শব্দের প্রথম অক্ষর দিয়ে সম্রাটের নাম।

My very first encounter with Chemistry, which later became my profession in life, was the day in class IX when Durganshankar-da took us to the Chemistry Laboratory. He dabbed cotton soaked in ether to our hand – the cold sensation startled us. Next, he released hydrogen sulphide gas from a Kipps apparatus filling the place with a foul smell. So, we got introduced to Chemistry using our senses.

The first time I saw sea was during an educational trip to Puri, under the supervision of Kalidasda, our biology teacher. We collected a large number of samples, brought them back to Vidyapith dipped in formalin. Not sure where we got all the samples from; these days when we visit the beach, we don't find many living creatures or even shells. In the biology class we used to dissect cockroach, earthworm and frogs. I remember finding black eggs on opening up toads. It was difficult for me to have tiffin of ghugni mangsho after the class.

Finally, let me pay my obeisance to Sushil Roy-da, who was extremely proud of the intelligence and capability of our batch. He would say that all the ranks in all the streams in the Higher Secondary Board Examination would come to us, and there would be sweets for all and sundry to feast on for days together after the results are out. Unfortunately, for a twist of fate that never materialized and most of us were thrown out of the school in 1970. Given the jolt in our life, when we look back, our batch has done reasonably well in our careers, especially when it comes to সরস্বতী সাধনা; at least nine of us have done their PhD in different fields from universities in India and abroad. We also had our fair share of teachers, engineers, doctors, bankers, entrepreneurs, scientists, accountants (no lawyer though and none in administrative service). So, in a way Sushilda's dream was not completely shattered.

Sushilda was particular about our health. He used to wake us up early in the morning in the fourth hostel, and start our day with a handful of ছোলা ভেজা। Before that he would wake Nanda and Pulak up to ring the first bell of the day – apparently it needed two of them to continue ringing for a considerable length of time. Though rather irregular I still retain the habit of doing some physical exercise and yoga even now.

Because of the abrupt end of our stay at Vidyapith, we were deprived of the opportunity to take a formal farewell from our teachers and from each other, which is usually one of the most memorable days in the life of any student. One of my greatest regrets in life is that somehow, I could not meet Sushilda before he left for his heavenly abode, although I got back to Kolkata in 1997 when he was still alive. The new social media have now allowed our batch mates to get in touch again and also with the other alumni of Vidyapith, and every now and then we get back to our school days.

আমাদের চলার পথে, গত কবছরে আমরা দুজনকে হারিয়েছি - বাসব ব্যানার্জী আর পিনাকী বড়ুয়া। শেষ করার আগে ওদের স্মরণ করি।

Pinak Chakrabarti

A memorable journey

As I sat to write about my life and time at Vidyapith, lots of memories floated in my mind. Though some of them had faded, a few are still etched clearly on the canvas of my journey of Vidyapith.

The early part of my childhood was spent in north Kolkata – easy-going life with lots of friends and fun. My father decided, it was time for me to have a more structured life in a loving, caring environment where I can have a great education as well. So, my parents decided to send me to Vidyapith, Purulia. I joined Vidyapith in 1967 in eighth grade.

I remember my days at Vidyapith started with the sound of morning bell to wake up and at night with another bell reminding us time for bed. The days were usually packed with standard routines like early morning and evening Bhajans, playtime, study time, school, etc. Because of the Dhoti wearing skill learned then today friends come to me for help in wearing a dhoti.

I still remember the prayer written by Mohit*, "Ma tomai ki pabona, Thakurer monay bhabona.".* I was most impressed by Uttarayan's emotional recitations on stage. Suranjan Chatterjee was a great all-rounder and represented our class in every game. I was proud of our class and my friends. I was confident that there will be a few students that will rank in the top 10 in Higher Secondary examinations. Unfortunately, only 4 of our entire class graduated from RKMV, Purulia in 1971. We all know what happened.

While visiting my uncle in Purulia in 1986, I visited Vidyapith, unfortunately, it was closed for winter break and we were not allowed in.

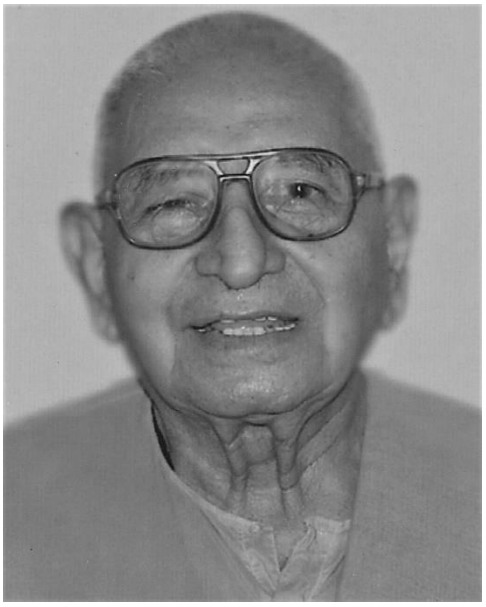

Kalipadada (Swami Putananda) was my favorite Maharaj. He always spoke highly of me to my parents except when they visited the last time to pick up my stuff. I never met another human being like him. Whenever I visited India, always tried to visit Maharaj, mostly at Balaram Mandir. In the beginning, he would remember me but the last few times, I had to remind him who I was. I miss his simplicity. Only thing I never understood, why he had to pick his nose in the dining room while we were having dinner.

Among our teachers, I remember Sushilda and Perumalda very well. I used to fall asleep in Perumalda's math class in the afternoon. He used to throw chalks at me to get my attention. It happened so many times that he wanted to keep a parrot in the class who will call my name every time I dozed off.

Once I tried to get an early start on Wednesday (½ day school) by getting a haircut during the 4th period. When I arrived at the location, I found Sushilda getting his hair cut. I got a long lecture from him that day. Needless to say, it was not an early start to my ½ day!

We all remember the incident at the Panchet Dam trip. I lost two of my idols that day, Ashok Parida and Gyaneswar Singh. During study hours, I would seek help from Ashok on mathematics. I still remember his beautiful, neat small font writings. He always had time and patience for me. Gyaneswar was the best table tennis player among us. His style of playing got me interested in the game. I always try mimicking his forehand top-spin. He also was a great artist.

Later I found out that they both were excellent swimmers! The incident at the dam could have been handled better by the management. It proved fatal to leave young minds to ponder over the incident for about a week without the usual routine. Starting the classes on a Sunday was the best decision ever, though I did not agree at that time.

Nisith once wished me goodnight by shaking my hand after I cleaned up outside the dining room. Needless to say, he did not clean his hand. We were the happiest bunch of kids enjoying growing up surrounded by friends all the time. I must confess that I liked Pulak's hairstyle. I am still trying to copy that.

Hopefully, I would see you all at Purulia in February 2022 to celebrate the 50th school leaving anniversary and update the faces, and fill the gaps in my memory. I believe my years in Ramakrishna Mission Vidyapith steered me in the right direction. Thanks to all of you for a memorable journey.

Debkumar Bonnerjee

5/8
1984

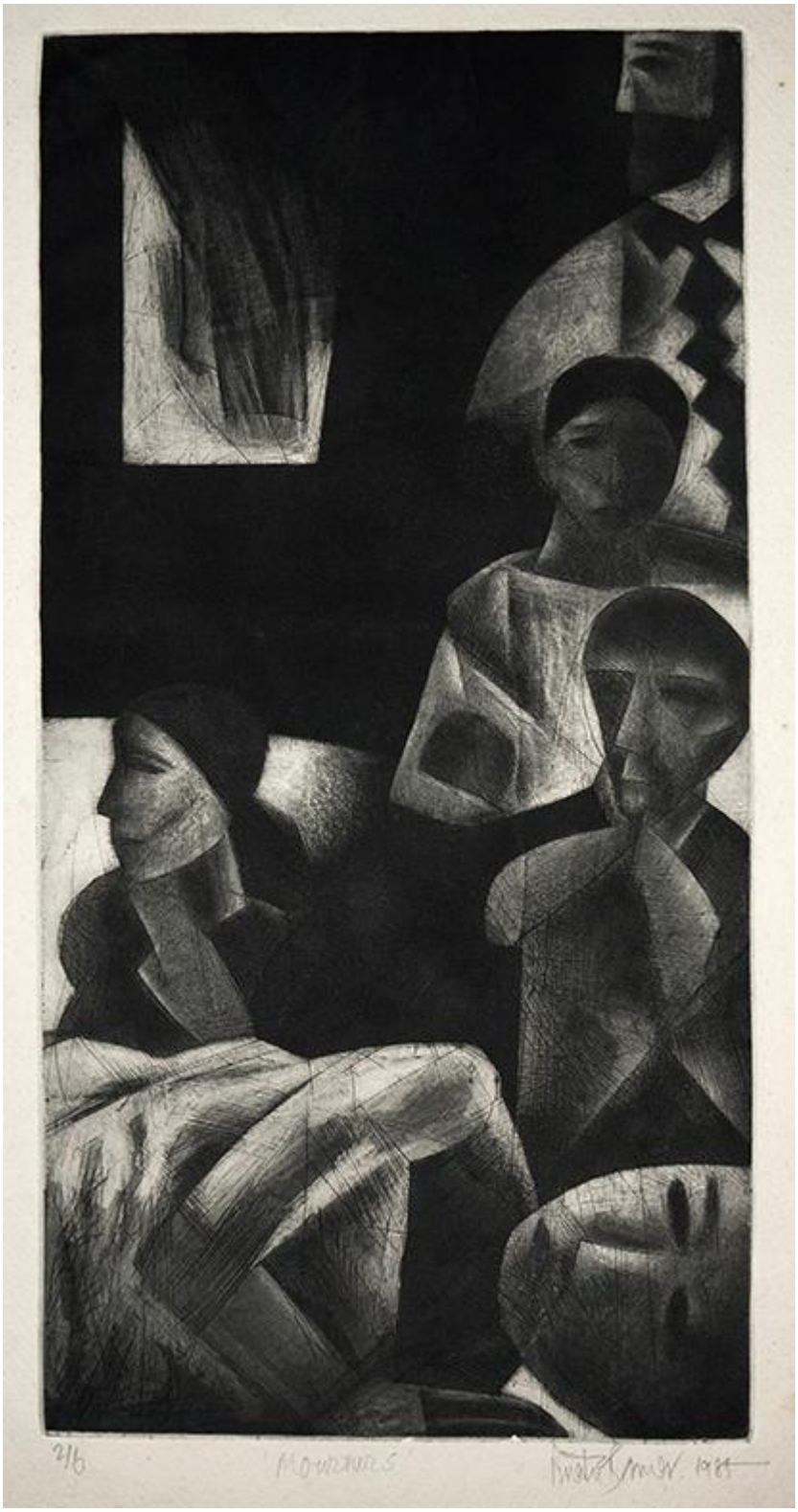

Pinaki Barua: a friend, a realist, a legend

Naomi Shihab Nye wrote: *When a stranger appears at your door, feed him for three days before asking who he is, where he's come from, where he's headed. That way, he'll have strength enough to answer. Or, by then you'll be such good friends you don't care.*

A long time ago, a stranger appeared in the dormitory of a boarding school in Purulia and was welcomed by another boy. They studied together, they shared chocolate candies on their birthdays, and exchanged stories of their childhood, as they walked to the dining hall or the playground. *They became good friends*.

One afternoon they hovered over a painting of a train passing on the horizon of palms. One of the boys inquired why the bright and colorful panorama seen from the window, was transformed into a gloomy landscape tinted in deep blue. The painter replied, *to see things clearly, reality needs to be transformed.*

The painter of the train scene turned into a legendary Realist, creating a vast and extraordinary collection of etches, images, and artworks that posed questions to our time. His classical artwork Mother and Child, *with superb craftsmanship and excellent distribution of forms, revealed the dialectics of love and hate, of war and peace, and of life and death.*

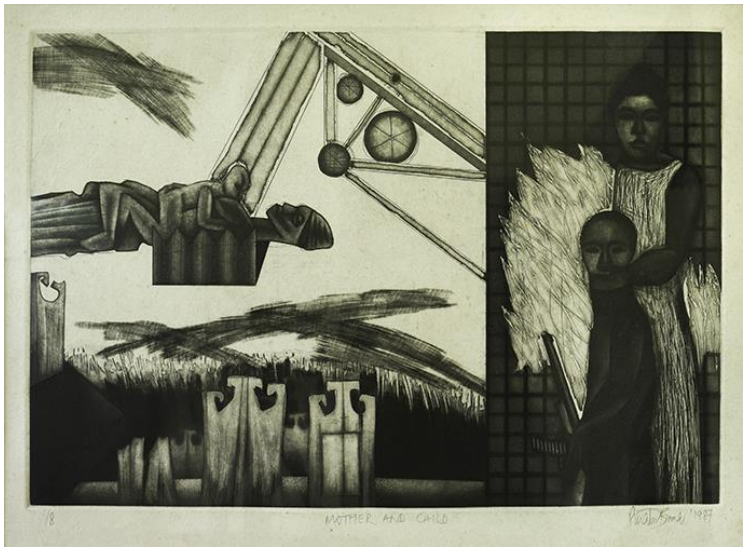

Many years later, the two boys met again. During their brief encounter, they hovered over some artworks in making and shared the story of art lovers in the snow-clad Arctic mesmerized by monochromatic *Our Christs* reflecting the pain of tropical Latin America.

On the way back to the metropolis by train, one of the boys connected the dots between the life and times of his two art heroes. One mastering the words and stories of *Magical realism* in Colombia and the other crafting the *Realist* etches, woodwork, and images in India.

He now sits in the scarcely lit room in Nicaragua to celebrate the lives of both of them. He does not stop looking at the artworks of Pinaki Barua through his tear-filled eyes, as he searches for the *duality of the coldness of death and resurrection of love*. He also reads over and over, the words of Gabriel Garcia Marquez: *What matters in life is not what happens to you but what you remember and how you remember it*.

Falguni Guharay

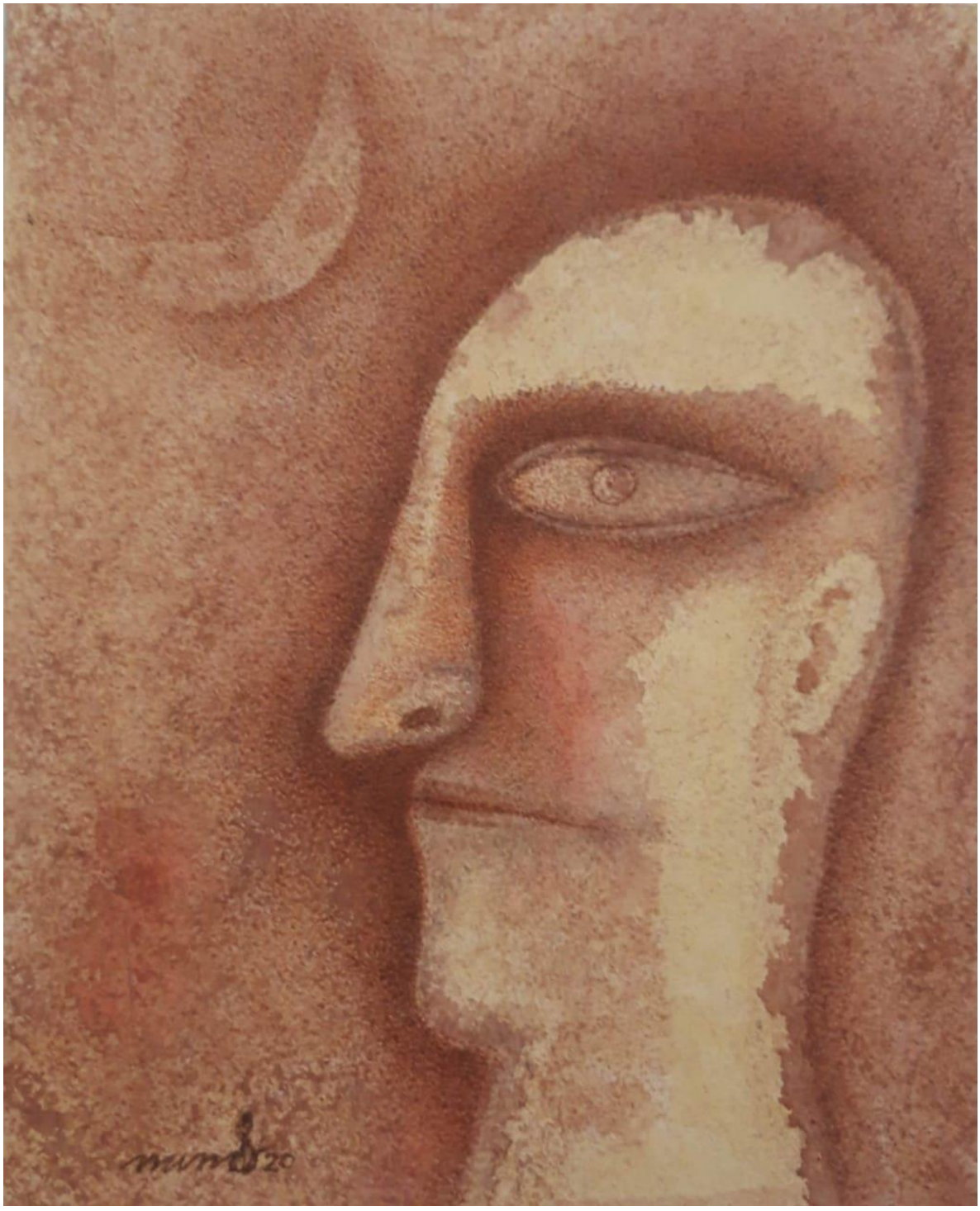

কোলাজ

|| ভূমিকা ||

মুছে গেছে বেশকিছু সেইসব ফেলে আসা দিন
তবু যতটুকু আছে তার কিছু আজও অমলিন।
যতটুকু পারি তার এঁকে রাখি ফাঁকা ক্যানভাসে
কেউ যদি চেয়ে দেখে, কেউ যদি দেখে ভালবাসে।

(এক)

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে তখন ছাত্রজীবনের বছর দুয়েক কাটিয়েছি। তখন অ্যাডমিশন টেস্টে উত্তীর্ণ ছাত্রদের তাদের মা-বাবারা ভর্তি করিয়ে রেখে চলে যাওয়ার দৃশ্যটা ছিল বড়ই শোকাবহ। বিশেষত ক্লাস ফোর, ফাইভ, সিক্সের শিশু ও তার বাবা-মা উভয় তরফেই বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ছিল দুঃসহ। একদিন মাতৃধাম না কোন ধাম মনে নেই (স্কুল বিল্ডিং এর পিছনে বাঁ দিকের ধাম), তার নীচে কালিপদ মহারাজের অফিসের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে একটি শিশুর চিল চিৎকার শুনে কৌতূহলবশত থমকে দাঁড়িয়ে দেখি একটি ক্লাস ফোর এর শিশু মাকে আঁকড়ে ধরে না ছাড়ায় ক্রন্দনরত শিশুকে নিয়ে তার বাবা-মা কালিপদ মহারাজের শরণাপন্ন হয়েছেন।

সম্ভবত তাঁরা অল্প সময়েই বুঝে গেছেন এমন সহৃদয় সাধু এই একজনই যাঁর কাছে ছেলেকে রেখে যাওয়ার মতো নির্ভরযোগ্য স্থান আর নেই। কালিপদ মহারাজ অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শিশু ও তার মা উভয়কেই কান্না থেকে বিরত হওয়ার সস্নেহ সান্ত্বনা দিচ্ছেন। ঘটনাটা আমাকে অবাক করেনি কারণ এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, মা ও শিশুর কান্না থামাতে গিয়ে কালিপদ মহারাজের চোখে জল। উনিও কাঁদছেন। তাতে অবাক না হয়ে পারিনি। শ্রদ্ধায় আনত হয়ে উনাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। মা ও শিশুর বিচ্ছেদ ব্যথা যেটার নিরসন করতে অনেকেই ধমক ধামক দেন, কিন্তু কালিপদ মহারাজের সেই ব্যথাটা অনুভব করার মতো বড় হৃদয় ছিল বলেই তাঁর চোখে জল। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম।

(দুই)

ক্লাস নাইনে আর্টস বিভাগে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন চিত্ত-দা (চিত্তরঞ্জন দত্ত) I আর্টসের আমরা গুটিকতক ছাত্র সব শিক্ষক সবচেয়ে ভয় পেতাম উনাকে। উনার ক্লাসে অন্যমনস্ক হলেই ধরা পড়ে যেতাম আর সঙ্গে সঙ্গে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন -- কি বললাম বল তো? উত্তর না পেলে চূড়ান্ত অপমান। অনেকেই কোন না কোন বার এই অপ্রীতিকর ঘটনার শিকার হতাম। ব্যতিক্রম ছিল সম্ভবত সজল আর জয়নারায়ণ। যমের মতো ভয় খেতাম বটে, কিন্তু পড়াতে পড়াতে মাঝে মাঝে উদাহরণ ছলে কিছু কথায় রসবোধের প্রকাশ দেখে তাঁকে খুব ভালও লাগতো। একদিন পিরিয়ড শেষ হবার মিনিট পনের আগে উনার পড়ানো শেষ হয়ে গেছে। উনি হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে বললেন -- একঘেয়ে ইকনমিকস্ পড়ে মাথাটা ভারি হয়ে গেছে। একটু সময় আছে, একটু অন্য বিষয় নিয়ে খেলি। তোমরা ইংরেজি ক্লাসে সম্ভবত একটি বিখ্যাত কবিতার লাইন পড়েছো। সেটা হল "If winter comes, can spring be far behind?" এই লাইনটা যে যেমন পারো বাংলায় অনুবাদ করো, কিন্তু কবিতার মতো করে। সকলেই লিখলো যে যার মতো। আমি লিখেছিলাম -- "শীত যদি যায় তবে / বসন্ত কি দূরে রবে?" উনি প্রত্যেকের অনুবাদ শুনলেন এবং বললেন -- আমিও একটা অনুবাদ করেছি, শুনবে নাকি! আমরা সমস্বরে 'হ্যাঁ' বলতেই উনি বললেন -- "ধুলোওড়া ঝরাপাতা দিন কবে / কৃষ্ণচূড়ার ডালে আগুন ঝরাবে?" শব্দ দিয়ে শুধু ভাব প্রকাশ নয়, তার চেয়ে বেশী কিছু প্রকাশ করা যায় সেই প্রথম অনুভব করলাম। কবিতার প্রতি আমার প্রথম প্রেমও সেদিন থেকে।

আর একদিনের কথা। ইকনমিকসের পাঠ্য বিষয়ের ক্রমানুসারে পাঠ দিয়ে যাচ্ছিলেন চিত্ত-দা। যে চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে কোনো শিল্পোদ্যোগ গড়ে ওঠে, তা নিয়েই পাঠদান চলছিল। আগের দু দিনে শেষ হয়ে গেছে Land ও Labour নিয়ে আলোচনা। বাকী ছিল Capital আর Organisation. আমরা সবাই মিলে চিত্ত-দা ক্লাসে আসার আগে আলোচনা করে নিলাম, আজ চিত্ত-দাকে গল্প বলার জন্য অনুরোধ করবো। কিন্তু এটা সিদ্ধান্ত করা গেল না বেড়ালের গলায় ঘন্টা কে বাঁধবে। চিত্ত-দা ক্লাসে ঢুকলেন। ব্ল্যাকবোর্ডটা ডাস্টার দিয়ে মুছেই আমাদের দিকে তাকিয়েই বললেন -- একটা গল্প বলি শোনো। গল্প না বলে ঘটনাও বলা যায়। আমরা পরস্পরের দিকে চাইলাম। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এ তো দেখছি মেঘ না চাইতেই জল। উদগ্রীব হয়ে গল্প শোনার জন্য প্রস্তুত সবাই। চিত্ত-দা বলতে শুরু করলেন -- ঘটনাটা কলকাতার।

কলকাতা, দ্য ক্যাপিটাল অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল। সেখানকার স্টার থিয়েটার হলে রমরমিয়ে চলছে একটা নাটক। সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' | বাংলা নাটক। ম্যাকবেথের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, আর লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় সরযূবালা দেবী। সেই নাটকের একটি রোমহর্ষক দৃশ্যে সরযূবালার অসাধারণ অভিনয় মুগ্ধ করল দর্শকদের। হাততালিতে ফেটে পড়লো সমগ্র থিয়েটার হল। কেউ বললো 'অপূর্ব', কেউ বললো 'এক্সেলেন্ট', কেউ বললো 'বিউটিফুল', আবার কেউ বললো 'ক্যাপিটাল' | আজ আমরা যে টপিক নিয়ে আলোচনা করবো সেটাও হল 'ক্যাপিটাল', কিন্তু ঐ দুটোর কোনটির অর্থের সঙ্গে এর মিল নেই। এই 'ক্যাপিটাল' এর বাংলা প্রতিশব্দ হল মূলধন বা পুঁজি। বিষয়ের প্রতি মনকে আকর্ষণ করে পাঠদান এবং পাঠ্য বিষয়কে সুখপাঠ্য করে তোলার এই অভিনব পদ্ধতি শিক্ষাপ্রদানের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলে আমার মনে হয়েছিল। তাই উনার কাছে একাধিকবার বকুনি খেলেও উনার প্রতি শ্রদ্ধা আমার অটুট ছিল।

(তিন)

খুব মনে পড়ে কেষ্ট-দার (কৃষ্ণপদ বেরা) কাছে কাঠের কাজ শেখার ক্লাস করার কথা। উনার ক্লাস তথা কারখানায় ঢুকে সবাইকার বাঁধনছাড়া আনন্দ। শিক্ষকসুলভ গাম্ভীর্য রাখার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করলেও অতজন ছাত্রের সবাইকে সামলাতে আর কাজ শুরু করার কাঠ যোগান দিতে হিমসিম খেতে খেতে সেটার অস্তিত্ব উধাও হয়ে যেত। সবাইকার চেঁচামেচিতে যখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটতো, তখন কেষ্ট-দা 'এক চড়ে.....' বলে তাঁর হাতটা যে পরিমাণ ওপরে তুলতেন সেখান থেকে সমপরিমাণ গতিতে সেটা যদি ছাত্রটির মুখমণ্ডলের বামদিকে আছড়ে পড়তো, তাহলে তার প্রভাবে তার হাসপাতালগমন নিশ্চিত ছিল। কিন্তু প্রতিবারই সেই হাত গালের ছ' ইঞ্চির কাছাকাছি এসেই থেমে গিয়ে নেমে যেতো। এই ঘটনায় অভ্যস্ত হয়ে আমাদের দুষ্টুমি মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়াতো। শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের সম্পর্ক যে রসিকতার নয় এ কথা বেমালুম ভুলে কয়েকজন কেষ্ট-দার কাছে গিয়ে কাঠ চাইতো এই সংলাপে -- "কেষ্ট-দাদা, কষ্ট করে কাষ্ঠ একটা দিন।" সঙ্গে সঙ্গে কেষ্ট-দা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বলতেন --- ইয়ার্কি হচ্ছে নয়, সাহস তো কম নয়, এক চড়ে..... | চড় যে গাত্রস্পর্শ করবে না এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সে মিটিমিটি হাসতো আর কেষ্ট-দা চড়ের বদলে তার হাতে কাঠ ধরিয়ে দিতেন। শিক্ষক হয়েও কেষ্ট-দা ছিলেন বন্ধুর মতো।

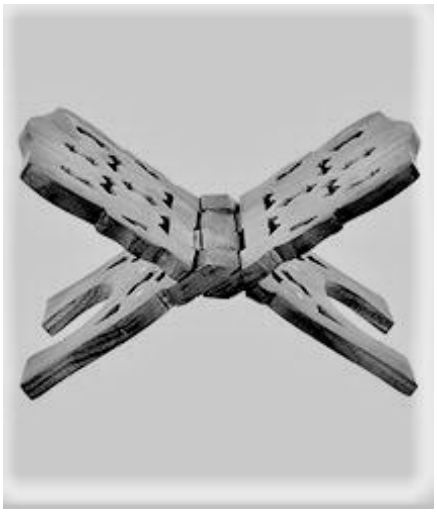

(চার)

কিছুদিনের জন্য সান্নিধ্য পেয়েছিলাম কয়েকজন শিক্ষকের, যেমন শম্ভু-দা, রেবতী-দা ইত্যাদি। মনে থাকার কথা নয়, তবু কি করে যে তাদের ভুলিনি তা নিজেও জানিনা। শম্ভু-দা আমার কাছে ছিলেন স্মার্টনেসের প্রতীক। তাঁর চলা, কথা বলা, পড়ানো সবেতেই যেন আভিজাত্যের ছাপ। রেবতী-দাকে মনে আছে কোন এক পিরিয়ডের শেষাংশে তাঁর কাছ থেকে শোনা একটা গল্পের জন্য। গল্পটা মোপাঁসার। অনেকেরই জানা, তবু সংক্ষেপে বলি।

অভিন্নহৃদয় দুই বন্ধু (মূল গল্পে ছিল প্রেমিক প্রেমিকা) | সেই বন্ধু দু'জন একদিন বিকেলে ঘুরতে ঘুরতে একটা নদীর পারে ব'সে গল্প করতে লাগল। এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে জিগ্গেস করলো -- তুই আমাকে সত্যিই ভালবাসিস? অপর বন্ধু বললো -- অবশ্যই। তোকে আমি ভীষণ ভালবাসি। সে বললো -- কতখানি? অপর বন্ধুর উত্তর -- অনেকখানি। সেই বন্ধু বললো -- আমি জানতে চাইছি আমার চেয়ে বেশী তুই কাকে ভালবাসিস? অপর বন্ধুটি বললো -- কাউকে নয়। এই পৃথিবীতে তোকেই আমি সবচাইতে বেশী ভালবাসি। সেই বন্ধুটি বললো -- এটা তুই মিথ্যে কথা বললি। আমার চেয়ে অন্তত একজনকে তুই বেশী ভালবাসিস। অপর বন্ধুটির কৌতূহলী প্রশ্ন -- কাকে রে? সেই বন্ধুর সহাস্য জবাব -- মাকে। কি ঠিক বলেছি কিনা ! অপর বন্ধু কথাটা শুনে একটু থমকে যায়। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে -- হ্যাঁ ঠিক, মাকে আমি খুব ভালবাসি, তবুও বলছি তোকে আমি মায়ের চেয়েও বেশী ভালবাসি। হাসতে হাসতে বন্ধুটি প্রশ্ন করে -- প্রমাণ দিতে পারবি? অপর বন্ধুটি বলে -- প্রমাণ? হ্যাঁ। কি প্রমাণ চাই বল। সে বলে -- একটা উপহার। -- কি উপহার? অপর বন্ধুর জিজ্ঞাসা। তার প্রাণের বন্ধুর উত্তর -- আজ গভীর রাতে আমি এই নদীর ধারে অপেক্ষা করবো। তুই তোর মাকে মেরে তাঁর হৃদপিণ্ডটা কেটে এনে আমাকে উপহার দিবি। অপর বন্ধুটি কিছুক্ষণের জন্য বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে। তার বন্ধু যখন শুধায় -- কি হলো, পারবি না তো? তখন তার সম্বিত ফেরে। একটু চিন্তা করে ধীরে ধীরে সে বলে -- ঠিক আছে, তাই হবে। উভয়ে বাড়ি চলে যায়। বন্ধুকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মনে রেখে অপর বন্ধুটি যাবার পথে একটা ছুরি কিনে নিয়ে যায়। বাড়ীতে ফিরতে দরজা খুলে তার মা বলে ওঠে -- কি করছিলি এতক্ষণ, এত দেরী হলো কেন? বিকেলে কিছু খাস নি। কিছু খাবি বাবা ! ছেলের মুখে কোন কথা নেই। শুধু ঘাড় নেড়ে 'না' জানায়। তার গম্ভীর মুখ দেখে মা জিগ্গেস করে -- মুখটা অমন গোমড়া করে আছিস কেন? কি অত চিন্তা করছিস, কিছু হয়েছে? এবারও 'না'সূচক ঘাড় নেড়ে সে নিঃশব্দে নিজের ঘরে ঢুকে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পরে মা তার ঘরে ঢোকে। হাতে গরম খাবারের থালা। বলে -- তাড়াতাড়ি খেয়ে নে বাবা।

সেই কখন খেয়েছিস, মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। শরীর ঠিক আছে তো ! অন্যদিন কত গল্প করিস। এই বলে ছেলের গায়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখে। ছেলে মনে মনে বলে, ক্ষমা কোরো মা ! এই বলে দেরী না করে ছুরিটা বার করে আমূল বিঁধিয়ে দেয় মায়ের বুকে। মাকে মাটিতে ফেলে বুকটা চিরে উপড়ে নেয় তার হৃদপিণ্ডটা। বন্ধু এতক্ষণে হয়ত নদীর তীরে চলে এসেছে। সে দু'হাতে রক্তাক্ত হৃদপিণ্ডটা নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় হঠাৎ পায়ে পা জড়িয়ে আছড়ে পড়ে যায়। হাত থেকে ছিটকে একটু দূরে পড়ে হৃদপিণ্ডটা। সেটা তখনও কেঁপে কেঁপে উঠছে। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে হৃদপিণ্ডটা নিতে যাবে, তখন হৃদপিণ্ডটা থেকে স্পষ্ট ভেসে এল মায়ের কণ্ঠস্বর -- "আহা, পড়ে গেলি ! কোথাও লাগলো নাকি বাবা !"

গল্পটা এখানেই শেষ। গল্পের বিষয়মাধুর্য ও রেবতী-দার বাচনভঙ্গী আমাদের এমন আবিষ্ট করে দিয়েছিল যে আমরা সকলেই বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আর মাত্র কিছুদিনের শিক্ষক হয়েও আমার স্মৃতিতে জায়গা করে নিয়ে ছিলেন।

(পাঁচ)

হোস্টেলের অনেক স্মৃতি হোস্টেলবাসীদের কাছে জীবন্ত হয়ে আছে। আমি হোস্টেলবাসী না হলেও হোস্টেলের একটা স্মৃতি পরের দিন ক্লাসে ভাইরালের মতো আলোচিত হওয়ার জন্য মনে থেকে গেছে। আমাদের এক সহপাঠীর উচ্চারণের একটি সমস্যা ছিল। এখন সে সমস্যামুক্ত হয়ত হয়ে গেছে। কিন্তু সেই সময় সে 'ল' ব্যঞ্জনবর্ণটিকে 'ব' হিসেবে উচ্চারণ করতো। সেদিন তাকে নিয়ে তার আগের দিন রাত্রের হোস্টেলের একটি ঘটনা হাস্যরসের উপাদান হিসেবে অনেক জায়গায় আলোচিত হচ্ছিল। ঘটনাটি হলো : সহপাঠীটির পাশের বেডে যে সহপাঠীর বেড ছিল তার নাম ছিল নীলাদ্রি। মধ্যরাত্রে উদ্দিষ্ট সহপাঠীটিকে সম্ভবত কোন কীট দংশন করায় যে সংলাপ সহযোগে সে চিৎকার করে উঠেছিল তা ছিল এইরকম : "নীবাদ্রি, নীবাদ্রি, আবো জ্বাবো, আবো জ্বাবো, আমাকে কি কামড়াবো!"

(ছয়)

শেষ করি উত্তর একাত্তর পর্বের একটি ঘটনা দিয়ে। সাল ১৯৭৪। তখন আমি সবেমাত্র গ্র্যাজুয়েট। কাজ বলতে কয়েকটা টিউশনি, তাও পুরুলিয়া শহরে

গিয়ে। খবর পাওয়া গেল কোন শিক্ষক বি.টি. পড়তে যাওয়ায় এক বছরের জন্য ডেপুটেশনে শিক্ষক নেওয়া হবে। কাকার উদ্যোগে ইন্টারভিউতে সুযোগ পাওয়া গেল। বাংলা শিক্ষকের পদ, তাও আবার ছোটদের জন্য। এই কাজের জন্যে নিজেকে অনুপযুক্ত মনে হয় নি। ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন স্বামী স্বামী রমানন্দের পরে যিনি হেডমাষ্টার মহারাজ ছিলেন (সম্ভবত স্বামী অমরানন্দ) । অত্যন্ত বিদগ্ধ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, কারণ ইংরাজি, বাংলা, সংস্কৃত থেকে অঙ্ক, বিজ্ঞান যে কোন বিষয়ে কারো যোগ্যতা নিরূপণের কৌশল ছিল অনবদ্য। গোটা পাঁচেক প্রশ্নতেই যোগ্যতা নিরূপিত হতো। আমার ক্ষেত্রে প্রথমেই কনে দেখার মতো নিজের নাম লিখতে বললেন। সেই মুহূর্তে অপমানিত বোধ করলেও পরে জেনেছিলাম ব্ল্যাকবোর্ডে আমার হস্তাক্ষর বোধগম্য হবে কিনা তার জন্য এই যাচাই। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছোটদের পাঠ্য যে কোন একটি কবিতা বলা। আমার মনে আছে আমি রবীন্দ্র নজরুল এড়িয়ে বুদ্ধদেব বসুর একটা কবিতা শুনিয়েছিলাম। আর একটা প্রশ্ন মনে নেই। শেষে ব্যাকরণের দুটি প্রশ্ন। প্রথমটি সম্ভবত পদ পরিবর্তন (বিশেষণ থেকে বিশেষ্য) । শেষ প্রশ্নটাই আমার ঐ ইন্টারভিউটা স্মৃতিতে চিরস্থায়ী হবার কারণ। প্রশ্নটা খুবই সহজ হয়েও কঠিন। অতি সাধারণ প্রশ্ন : বিপরীত শব্দ বলো -- 'সমস্ত' । আমি খানিক চিন্তা করে জানিয়ে দিয়েছিলাম -- পারবো না। অথচ ঘর থেকে বেরিয়েই উত্তরটা মাথায় এসেছিল। যাই হোক, আমাকে কেন নেওয়া যাবে না তা জানিয়েও দিয়েছিলেন। কবিতা পড়া নিয়ে বলেছিলেন -- অত আস্তে গলা ছাত্র পড়ানোর উপযুক্ত নয়। শেষ বেঞ্চ পর্যন্ত ঐ গলা পৌঁছাবে না। অর্থাৎ আমার ইন্টারভিউ শুধু আমার জ্ঞান নিয়ে নয়, আমার পড়ানোর যোগ্যতা নিয়েও আর সেটা আমার মাথায় ছিল না।

আর আমার শেষ প্রশ্নটা আমি গুরুপল্লীতে সমস্ত বাংলা শিক্ষককে জিগ্গেস করেছিলাম। ফণী-দা ছাড়া কেউ সঠিক উত্তর দেন নি। সকলেই বলেছেন 'শূন্য' । আর আশ্চর্যজনক ভাবে পরবর্তী পরীক্ষায় প্রায় সব ক্লাসে বাংলা ব্যাকরণের প্রশ্নে বিপরীত শব্দ লেখার প্রশ্নে 'সমস্ত' শব্দটি স্থান পেয়েছিল। ভেবে অবাক হয়েছিলাম যে এত শব্দ থাকতে শুধু ঐ একটি শব্দের বিপরীত শব্দ জানতে চেয়ে প্রার্থীর যোগ্যতা যাচাইয়ের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান শিক্ষকদেরই থাকে। উত্তরটা বলেই দেওয়া যেত। তার চেয়ে বরং কিছুক্ষণের জন্য হলেও সতীর্থদের চিন্তার খোরাক হয়ে একটু থাক।

সুব্রত ভট্টাচার্য

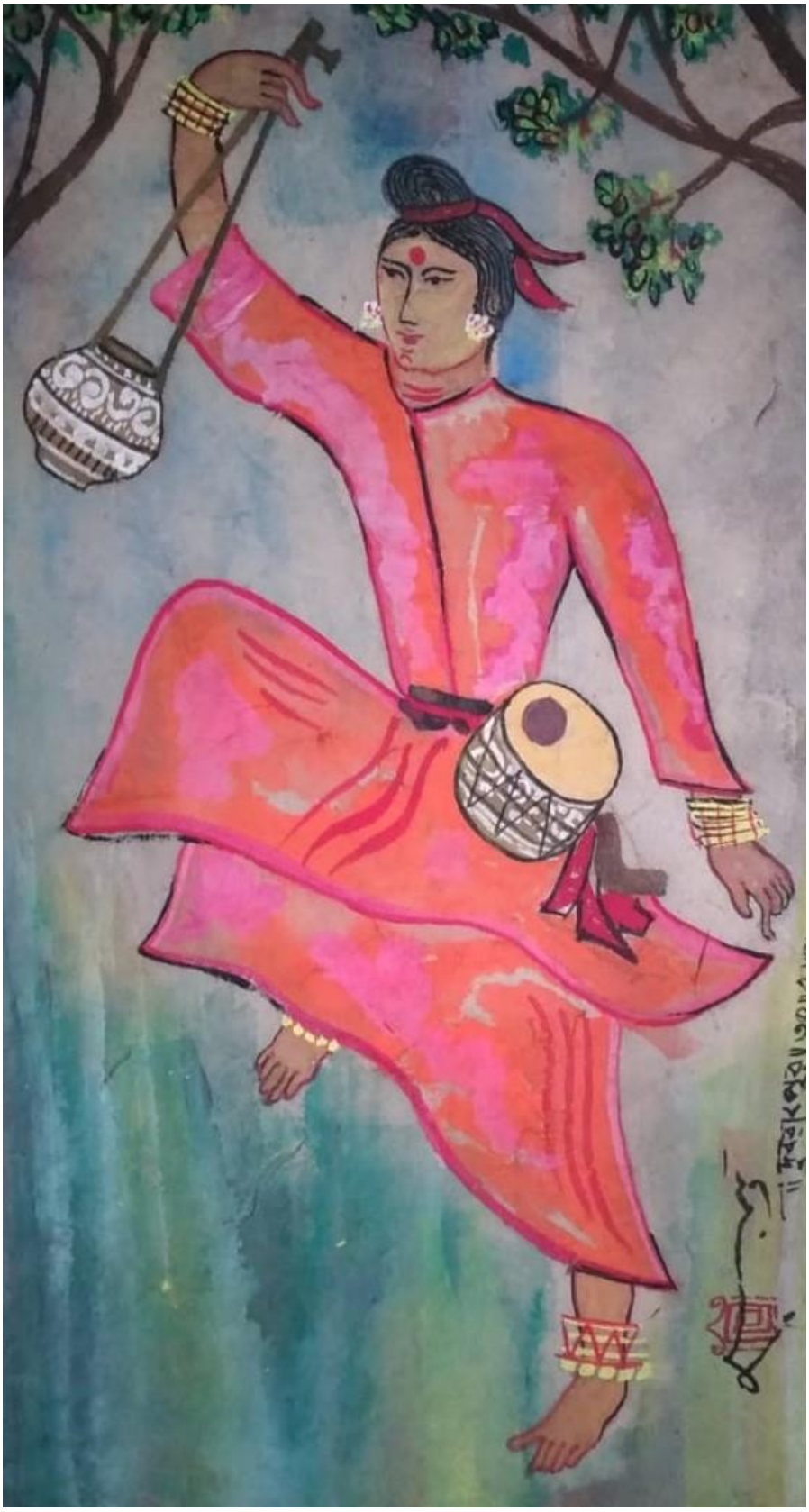

আমার দ্বিতীয় দেশের খোঁজে

আমাদের দেশ নাই। উদ্বাস্তু বাঙালদের মধ্যে দুটি কথার পরই একজন জিজ্ঞেস করবে – দ্যাশ কই? আমরার তো ময়মনসিংয়ে। অবইশ্য সেতো এখন নাই। এসব ষাট সত্তর বছর আগের কথা। দেশের বাড়ি আমাদের গল্পকথা। বাঙালের বাড়ি মানে দেশের বাড়ি, অন্য বসবাসের স্থান হল বাসা। আমাদের বাসা কলকাতায়, বাড়ি ময়মনসিংহ। আমাদের ভাড়া নেওয়া বাসা কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে। উদ্বাস্তু কলোনীর গায়ে। এককথায় সেটাও কলোনীই।

আমাদের ভাড়া বাড়ি পাকা কিন্তু আশপাশের কলোনী সব বেড়ার দেওয়াল, টিনের চাল। পুকুর, জলা, ঝোপ জঙ্গল আর দারিদ্র্য। এটাই আমার দেশ এখন? বাড়িতে দেশের লোকজন আসত, কখনো উদ্বাস্তু হয়ে আসা নিকট আত্মীয়স্বজন কয়েকদিনের জন্য ওই দু ঘরের বাসাতেই ভীড় করে থাকত। আমরা উন্মুখ হয়ে দেশের বাড়ির গল্প শুনতাম। আমাদের দেশ সেখানেই।

তখন ক্লাস সিক্সে বালীগঞ্জ গভরমেন্ট স্কুলে পড়ি। বছরের মাঝখানে পেলাম ভারত সরকারের মেরিট স্কলারশিপ, পড়তে হবে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে। তাহলে যেতে হবে পুরুলিয়া। সেই আমার প্রথম দূরের যাত্রা। আমাদের পরিবার দেশভাগের ধাক্কা তখনও সামলিয়ে উঠতে পারে নি। আমার বাবা আমাদের সুদূরের পিয়াসা মেটাতেন অফিস লাইব্রেরির বই এনে। তখন পযন্ত আমার সবচেয়ে দূরের যাত্রা ছিল নৈহাটী, মামাবাড়িতে। সেই আমি চেপে বসলাম, বাবার হাত ধরে, হাওড়া স্টেশনে রাতের আদ্রা চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে। তখন এই ট্রেন পুরুলিয়া পৌঁছত সকাল বেলায়। অন্ধকার যাত্রার কিছু মনে থাকার কথা নয় কিন্তু সকাল হলেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম ট্রেনের জানালায়। মা বারবার সাবধান করেছিলেন জানালায় বেশী মুখ না বাড়াতে কারণ ইঞ্জিনের ধোঁয়ার কয়লার গুঁড়ো এসে পড়বে চোখেমুখে। কিন্তু সে সব এখন অতীত, সামনে লাল মাটির জগত। একেবারে জলা জঙ্গল কাদামাটির দেশ থেকে এসে রাঢ় বাংলার লালমাটি চোখের সামনে। উঁচু নীচু ঢেউ খেলানো জমি। রেল লাইন গেছে কিছু পাথুরে জমি কেটে, সেই লাইনের পাশের উঁচু লাল মাটির দেওয়ালে বৃষ্টির জলধারায় যে ক্ষয়মান আল্পনা তা আমার কাছে মনে হয়েছিল বড় বড় লাল পিপড়ের বাসা নয় তো। তারপর, তারপর পাহাড়। সে যত গুরুত্বহীন টিলাই হোক না কেন সেই আমার প্রথম পাহাড় দেখা, তারপর আবার পাহাড়, অনেক উঁচু পাহাড়।

সে এক অন্য সকাল, পুরুলিয়া বোধহয় তখন থেকেই ধীরে ধীরে রক্তে প্রবেশ করছে, আমি ট্রেনের জানালায় হু হু করে সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া, কয়লার গুঁড়ো আর পাহাড়ের ছবি নিয়ে এক অন্য দেশে প্রবেশ করছি। এর অনেক বছর পরে পায়ে হেঁটে সাত পাহাড় পেরিয়ে এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে গিয়ে পাহাড় দেখার থেকেও এই পাহাড় দর্শন অনেক গভীরে প্রোথিত।

বছরের মাঝখানে এসে পড়লাম। একটু সময় লাগছিলো সবার সাথে মিশতে। কারণ আমি তখনো মিশন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত নই। রাস্তায় কোন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটছিলাম। এক উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র পাশ থেকে ফোড়ন কাটল – তার পর? আমি বললাম – তার আর পর নেই, নেই কোন ঠিকানা। বেলা বাড়তেই শুনলাম ফিসফাস – নতুন ছেলেটা আধুনিক গান দিয়ে উ ত্তর দিয়েছে।

ফিরে আসি পুরুলিয়ায়। বিদ্যাপীঠের পশ্চিমের আকাশ জুড়ে হাজির হল অযোধ্যা পাহাড়। বৃষ্টির পর আশ্চর্য নীল রঙে দূর আকাশের নীলকে হারিয়ে দিয়ে ছড়ানো থাকত অযোধ্যা পাহাড়। ছাত্রাবাসের পাশ দিয়ে রেল লাইন আর তারপরে কিছু দূরে আরেকটি পাহাড়। হস্টেলের দোতালার বারান্দা থেকে অনেক দূরের বৃষ্টিকে আসতে দেখতাম। আর মাঝে মধ্যে আশপাশের গ্রামের দিকে যাবার সুযোগ হলে দেখতাম এদিক ওদিক বিমূর্ত শিল্পের মত ছড়িয়ে আছে ছোটবড় শিলাখণ্ড। অনেক রাতে শুনতাম পাশের আদিবাসী গ্রামের মাদলের আওয়াজ। মনে হল উদ্বাস্তু সন্তান তাঁর দ্বিতীয় দেশ বোধহয় খুঁজে পাচ্ছে।

অনেকদিন পর দেশ পত্রিকায় (উত্তর-প্রেম পত্র, ১৯ মার্চ, ১৯৮৮) প্রকাশিত আমার গল্পের দুই সমকামী নারী তাদের নিজেদের খুঁজে পেয়েছিল এইখানেই – " বাংলা আর বিহারের মেশামেশিতে একটা টকঝাল স্বাদ, সাঁওতাল আদিবাসীদের চওড়া কাঁধ, পুরু ঠোঁটের অস্ট্রিক ঔদার্য, আর লাল মাটি। বৃষ্টির পর জল নেমে গেলে কি চকচকে মাঠ, তখন নীল আকাশকে কাঁধে নিয়ে গাঢ় নীল অযোধ্যা পাহাড় শহরের একটা দিগন্ত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শহরের বাইরেই খেত, উঁচু-নীচু মাঠ তাতে আলের বেড়ায় জ্যামিতিক নকশা। আমি আর কুহুদি যাচ্ছিলাম রিকশা চড়ে। কাঁসাই নদী অনেক দূরে দেখা যায়, বর্ষার জলে এখন ভরন্ত, কিছু চড়া জল আর সব জুড়ে অনেক কাশ। ..... কুহুদি বললো আজ ইভিনিং শোতে সিনেমা দেখাব তোকে, কমলা টকিজে উত্তমের বই এসেছে। আমরা দুজন. বড় কাছাকাছি এসে যাচ্ছি।"

পুরুলিয়া বড় কাছে এসে গিয়েছিল, যেন খোঁজ পাচ্ছিলাম আমার দ্বিতীয় দেশের।

মোহিত রায়

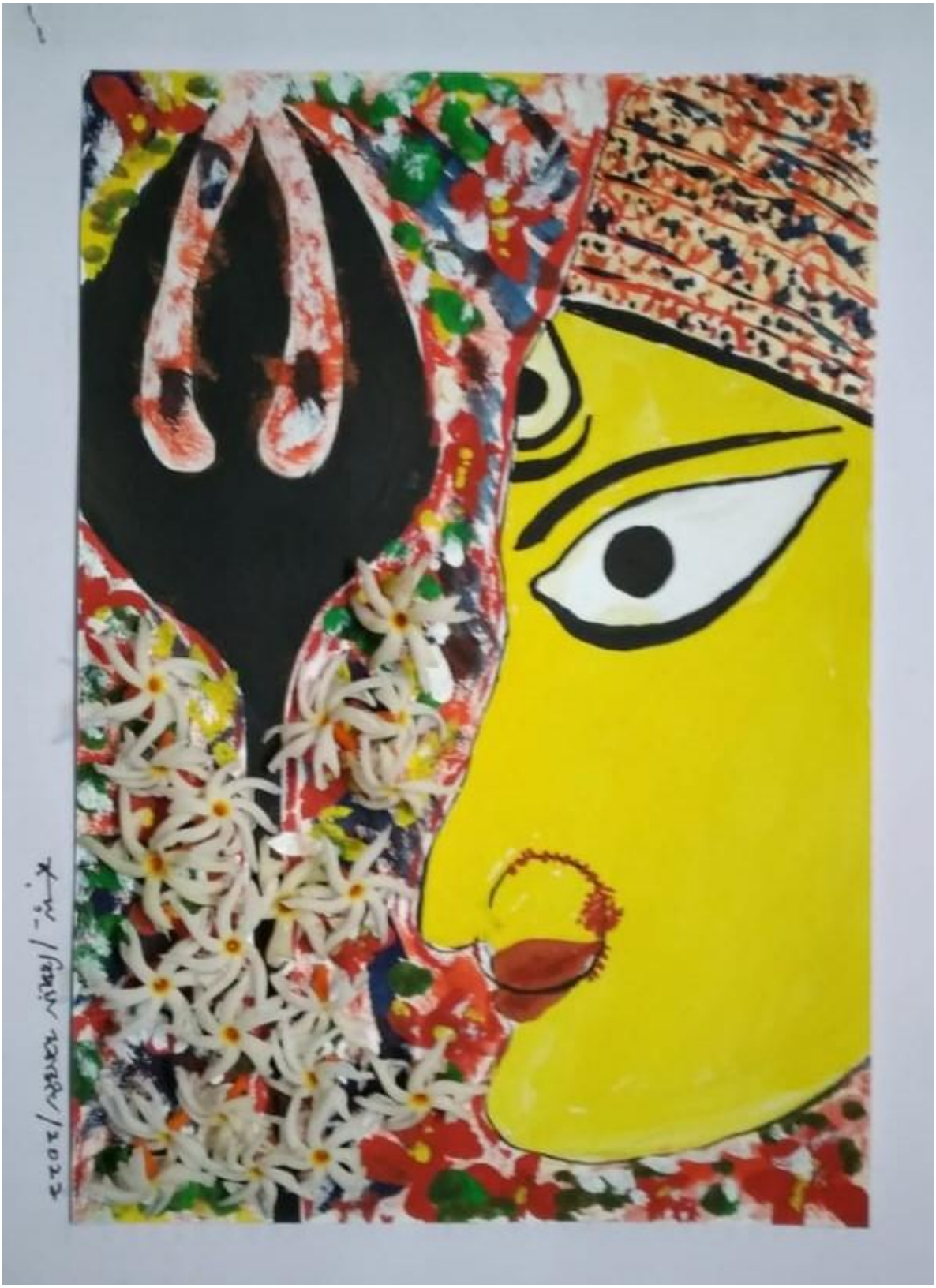

পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে "মহিষাসুরমর্দিনী"

প্রথমেই মনে হবে বিদ্যাপীঠে যাত্রাপালা। তবে এরকম তো কোন দিন হয়নি আগে। না যাত্রা পালা একেবারেই নয় । মহালয়ার দিন ভোরে বিশেষ প্রভাতী অধিবেশনে আকাশবাণী প্রচারিত জনপ্রিয় চন্ডীপাঠ ও সঙ্গীতালেখ্য যেটা আমরা সবাই আজ ও শুনি সেই "মহিষাসুরমর্দিনী " অনুষ্ঠানের কথাই বলতে চেয়েছি । ১৯৬৬ সালের এক সন্ধায় বিদ্যাপীঠের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত "মহিষাসুরমর্দিনী" র সান্ধ্য অধিবেশন অনেকেরই স্মৃতি থেকে হয়তো আজ মুছে গেছে । অনেকেই অবশ্য ১৯৬৬ সালে বিদ্যাপীঠেই ছিল না। সেই অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক কিছু স্মৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করছি মাত্র।

১৯৬৬ সালের পর দ্বিতীয় বার এই অনুষ্ঠান আজ পর্যন্ত বিদ্যাপীঠে হয়নি , ভবিষ্যতে হবেও না হয়তো । ৫৫ বছর পেরিয়ে আজ ৬ই অক্টোবর , ২০২১ মহালয়ার দিন সকালে ঐ সান্ধ্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী রূপকের সাথে আমার এই বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছু কথা ও তথ্য বিনিময় করতে গিয়ে মনে হোলো অনেক কিছু আমরাই ভুলে গেছি। আবার অনেক কিছুই মনে ও চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমরা দুজনেই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেছিলাম । পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে রূপকের মনে পড়লো ৫৫ বছর আগের বেশ কিছু ঘটনা ও সুন্দর অভিজ্ঞতা। দেবকীর অনুপ্রেরণায় তৈরী হোলো এই ছোট্ট লেখা আমাদের পত্রিকার সব পাঠকের জন্য।

১৯৬৬ সাল । আমরা তখন বিদ্যাপীঠে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি । আমাদের সবে মাত্র দু এক বছর বিদ্যাপীঠে কেটেছে । রূপক, বিদ্যাপীঠে ১৯৬৫ সালে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি । দেবকী একবছর পরে ১৯৬৬ তে সপ্তম শ্রেণীতে । আমরা গান গাইতে ও শুনতে ভালো বাসতাম । সংগীত ছিল আমাদের পাঠ্যসূচীর একটা বিষয় । স্বভাবতই গানের প্রতি ছাত্র হিসাবে আমাদের একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল ।

৫০ নম্বরের একটা পরীক্ষাও দিতে হোতো প্রতি বছর , অন্য বিষয়ের মতো । একবার মনে আছে বাৎসরিক পরীক্ষার শেষে বাড়ী যাবার জন্য প্রস্তুতি তখন শেষ পর্বে । এমন সময় হঠাৎ বেলা ১১ টা নাগাদ বেয়ারা হোস্টেলে এসে খবর দিল স্বামী রমানন্দ মহারাজ আমাদের তিনজনকে ; রুপক , দেবকী ও শ্যামাদাস কে শীঘ্র গানের ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার জন্য । আমরা গেলাম । গানের শিক্ষক গোপাল দা ও হাজির । মহারাজ তবলা বাজাবেন এবং আমাদের তিনজনকে একক ভাবে ওনার তবলার সাথে তাল রেখে গানের পরীক্ষা দিতে হবে দ্বিতীয় বার । ইতিমধ্যে তিনজনেরই গানের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে । কত নম্বর পেয়েছি সেটাও জানা হয়ে গিয়েছে । তবে আবার তড়িঘড়ি পরীক্ষা কেন । বাড়ীতে রেজাল্ট হাতে পাওয়ার পর তবলার সাথে গানের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হোলো । তিনজনের নম্বর কমে ৪২ থেকে ৩৬ হয়েছিল । প্রথমে নম্বর ছিল গানের । পরের নম্বর হোলো তালঞ্জানের !

ফিরে আসছি মূল বিষয়ে । একটা সুন্দর সময় অতিবাহিত করার পর ১৯৬৬ সালে হঠাৎ করেই অন্যত্র চলে যান আমাদের প্রিয় সংগীত শিক্ষক সব্যসাচী গুপ্ত দা । শান্তিনিকেতনের সংগীত ভবনের ছাত্র ছিলেন সব্যসাচী দা । সেইবছর ই গরমের ছুটির পর সব্যসাচী দার জায়গায় সংগীত শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলেন গোপাল চক্রবর্তী দা । ধুতি পাঞ্জাবী পরা নিপাট ভদ্রলোক। উনি এসেই সবার মন জয় করে নিলেন। রুপক সেইসময় বিদ্যাপীঠের সমস্ত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান অধিকার করতো বলে খুব সহজেই গোপাল দার ঘনিষ্ঠ হয়েছিল ।

এখনো পরিষ্কার মনে আছে অত্যন্ত রুক্ষ শুষ্ক এলাকা হলেও সেই বছর পুরুলিয়ায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী । চারদিকে প্রকৃতি সবুজ ও শ্যামল । শরতের আগমনে পুরুলিয়ার প্রাকৃতিক রুপের ও এক বিশেষ পরিবর্তন চোখে পড়লো। আমরা সে বছর যে হোস্টেলে থাকতাম তার ঠিক পেছনেই রেল লাইনের ধার বরাবর সাদা কাশফুলের শোভা ও আন্দোলিত সবুজ ধান ক্ষেত জানিয়ে দিলো আমাদের শারদ অবকাশ আসন্ন ।

ঠিক এই সময়ে হঠাৎ কানাঘুষোয় শুনতে পেলাম নবাগত সঙ্গীত শিক্ষক গোপাল দা নাকি বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের দিয়ে বেতারে প্রচারিত সংগীত - আলেখ্য "মহিষাসুরমর্দিনী" ওনার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত করবেন বিদ্যাপীঠের প্রেক্ষাগৃহে এক সন্ধ্যায় । অনুষ্ঠানটি নাকি হবে ঠিক মহালয়ার আগের দিন ।

বিদ্যাপীঠের তৎকালীন পরিচালন কতৃপক্ষ গোপাল দার এই সাহসী প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়ে অনুপ্রেরনা ও অনুমোদন দিলেন । সপ্তম শ্রেণী থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করার জন্য নির্বাচিত হোলাম রুপক , শ্যামাদাস, নন্দ ,অমিত, আর দেবকী ।

রোজ বিকেলে ক্লাসের পর খেলার ঘন্টায় শুরু হয়ে গেল 'মহিষাসুরমর্দিনীর' মহড়া। বেশীরভাগ উঁচু ক্লাসের ছাত্ররাই বেশী সুযোগ পেয়েছিল যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সোমশংকর সেনগুপ্ত , স্বপন সেনগুপ্ত , কান্তিময় দাস , নিখিলেশ দা । আরো অনেকেই ছিলেন যেমন অরুন ঘোষ, সুখেন দে ইত্যাদি । আমরা সবাই ছিলাম সমবেত সঙ্গীতে । স্বয়ং গোপালদা ছিলেন চন্ডীপাঠে । যদিও ওইসময়ে ক্যাসেট, সিডি ছিলনা তবুও গোপালদা গোটা সংগীতালেখ্যটার বাণী ও সুর অপরিবর্তিত রেখেছিলেন ।

এই অনুষ্ঠানে একক সংগীত গাওয়া অনেকটা পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মত । খুব জনপ্রিয় একটি গান "বাজলো তোমার আলোর বেণু " গানটি গাওয়ার জন্য রূপককে মনোনীত করা হোলো । গান টা শিখে গাওয়ার পর রামদা , গোপালদা ও অন্যান্য মহারাজরা রূপকের মনোনয়নকে সমর্থন করলেন । একজন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রর পক্ষে গানটা একটু শক্তই ছিল । যাইহোক বাকি সমবেত সংগীত সবাই খুব তাড়াতাড়ি রপ্ত করে ফেললাম । প্রথম প্রথম মহড়া চলত রোজ বিকেলেই কিন্তু যত দিন এগিয়ে আসতে লাগল ততই মহড়ার সময় বাড়তে লাগল । আবার একই সাথে পূজোর ছুটির আগে মাসিক পরীক্ষার পড়াশুনার চাপ ।

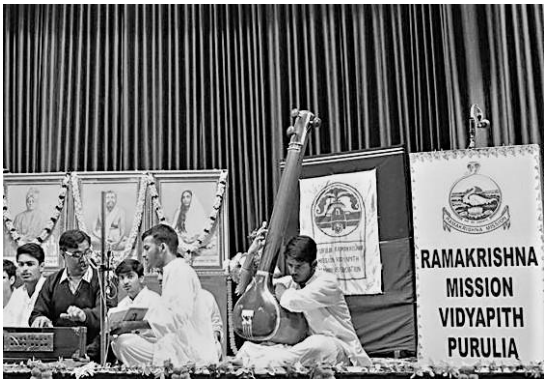

অনুষ্ঠানের মাত্র দিনকয়েক আগে হঠাৎ নন্দ মাম্পস নিয়ে বিদ্যাপীঠের হাসপাতালে ভর্তি হল। ওর জোরালো কণ্ঠের খুবই অভাব বোধ করছিলাম। ওর আকস্মিক অসুস্থতার জন্য গোপালদা ঠিক করলেন পাঠের পাশাপাশি নন্দর জায়গায় উনিও গাইবেন। অবশেষে চলে এল সেই বহু প্রতীক্ষিত মহালয়ার আগের দিনের সন্ধ্যা ।

বিদ্যাপীঠ প্রেক্ষাগৃহ কানায় কানায় পরিপূর্ণ। পুরুলিয়ার তৎকালীন জেলাশাসক (জাদুকর পি সি সরকারের জামাই) সহ আরো মান্যগণ্য ব্যক্তিত্বরা আমন্ত্রিত । মহালয়ার মত অনুষ্ঠান হবে সর্বোপরি শ্রদ্ধেয় রামদার মত শিল্পীর উপস্থিতিতে । কি অপরূপ এক পরিবেশ রচিত হয়েছিল তা আজ ও আমাদের রোমাঞ্চিত করে । গোটা প্রেক্ষাগৃহ ধূপের ধোঁয়া ও গন্ধে ভরে উঠেছে । একটা আলো আঁধারি পরিবেশ । ঠিক ঘড়ির কাঁটায় সাতটা বাজতে তিন বার ধ্বনিত হল মঙ্গলশঙ্খ । শুরু হয় গেল মহিষাসুরমর্দিনী । অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রথম একক সংগীতটি ছিল রূপকের কণ্ঠে । রূপক নিজে আজ ও স্বীকার করে সেইদিনের মতো অত ভালো গান আর জীবনে চেষ্টা করেও গাইতে পারেনি । একটা বিশেষ শক্তি ওর মধ্যে সেদিন বিদ্যমান ছিল হয়তো ।

গোটা প্রেক্ষাগৃহে একটা শারদোৎসবের পরিবেশ । সবাই নিজেদের সেরাটা নিংড়ে দিলাম । শেষ গান "রূপং দেহী " যখন শেষ হল গোটা প্রেক্ষাগৃহ দাঁড়িয়ে আমাদের অনুষ্ঠানকে অভিবাদন জানালো । অনুষ্ঠানটি এতটাই ভাল হয়েছিল যে পুরুলিয়ার তৎকালীন জেলাশাসক সেটি পুরুলিয়া শহরে পরের সপ্তাহে অনুষ্ঠিত করার কথা জানালে মহারাজ অক্ষমতার কথা জানালেন কারণ পরদিন মহালয়ার দিন থেকেই বিদ্যাপীঠের শারদ অবকাশ শুরু । অনুষ্ঠান শেষে একজন সপ্তম শ্রেণীর বালকের যে প্রশংসা জুটেছিল তার স্মৃতি আজও মহালয়ার দিন রোমন্থন করি ।

রূপক রায় চৌধুরী ও দেবকী নন্দন লাহা

আজ বেলাশেষে

সালটা ১৯৫৯। আমরা তখন ধানবাদ কোলিয়ারী অঞ্চলের বাসিন্দা। আমার পিতৃদেব ডাক্তার ছিলেন। তার প্রথম কর্মজীবন ১৯৪৮ সালে 'হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন',রাঁচি দিয়ে শুরু হয়। এরপর দুবছর পরেই ১৯৫০ সালে মেসার্স করমচাঁদ থাপর প্রা.লি. এর কোল ইন্ডাস্ট্রির সেন্ট্রাল হসপিটালে চাকরি নিয়ে ধানবাদে চলে আসেন, সেখানেই রিটায়ার করেন।

আমার প্রথম স্কুলজীবন ধানবাদের খ্রিষ্টান মিশনারি কো-এড স্কুল 'মাউন্ট কারমেল' দিয়ে শুরু হয়। আমার দুরন্তপনা পড়াশোনায় অমনোযোগিতা প্রভৃতি কারণই আমার বাবা মা-এর অন্যতম মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এইসঙ্গে তাঁদের নিজের বড় ছেলেকে মিশনের মতন প্রকৃত বোর্ডিং স্কুলে রেখে ভালোভাবে পড়াশোনা করানোর সুপ্ত ইচ্ছাটা অনেকদিন ধরেই মনের মধ্যে ধারণ করে রাখা ছিল। এই দুইয়ের যোগফলই আমাকে দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন নামক আবাসিক স্কুলে ভর্তি হোতে সাহায্য করেছিল।

নির্দিষ্ট দিনেই দেওঘর মিশনে গিয়ে স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরীক্ষায় বসতে হয়েছিল এবং তাতে আমি যথারীতি কৃতকার্য হয়ে বাবা মা-কে ঐ বয়সে ছেড়ে বোর্ডিং স্কুলে থেকে পড়াশোনা করব সেখানে অনেক বন্ধু হবে তাদের সঙ্গে পড়াশোনা যেমন করবো তেমনি বড় বড় খেলার মাঠগুলোতে মনের আনন্দে খেলব এই আনন্দেই মশগুল থেকে অবশিষ্ট দিনগুলো কাটিয়ে সেই নির্দিষ্ট দিনটি অর্থাৎ ১০ই জানুয়ারি ১৯৬১ ভর্তি হওয়ার দিনটি এসে হাজির হলো ।

দেওঘর রওনা দেওয়ার আগের দিনের রাত্রিবেলায় মায়ের আদেশে তাড়াতাড়ি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হয়েছিল কেননা পরের দিন ভোর সাড়ে তিনটেতে উঠে রেডি হয়ে নিয়ে ৫টার মধ্যে রওনা দিতে হবে। ঐ সময়ে রাস্তাঘাটের অবস্হা এখনকার মতন ছিল না, বেশ বিপদসঙ্কুল ছিল বিশেষ করে দেওঘর ঢোকার আগে ত্রিকূট পাহাড়ের অঞ্চলটাতে সন্ধ্যেবেলার দিকে গাড়ি আটকে চুরি ছিনতাই এমনকি ডাকাতি পর্যন্ত হতো। তাই আমাদের সময়মতন রওনা দিয়ে প্রায় দুশো কিলোমিটার রাস্তা পাঁচ সাড়ে পাঁচ ঘন্টা সময় নিয়ে পৌঁছে যেতে হয়েছিল।

আমরা কোম্পানির দেওয়া গাড়িতেই রওনা দিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে বাবা মা ছাড়া আর এক পাড়াতুতো কাকা শ্রী দীনবন্ধু ঘোষ এবং দেওঘর মিশনের এক পরিচিত শিক্ষক কাম ওয়ার্ডেন শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষদা'র (পুরুলিয়া মিশনের যেমন সুশীলদা)ছিলেন । উনিই আমার লোকাল গার্জেনও হয়েছিলেন। ওনার পিতৃতুল্য স্নেহ ভালোবাসা আমাকে মা-বাবা, ভাই-বোন আত্মীয় পরিজনদের মনকেমন করা মুখগুলোকে ভুলে থাকতে সাহায্য করেছিল।

আমার ধানবাদ থেকে দেওঘর মিশন পর্যন্ত মোটরযাত্রা আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সাঁওতাল পরগণার নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যপট আমার ছোট্ট বয়সের কৌতুহলী চোখ দুটোকে দারুণ তৃপ্ত করেছিল। আমাদের মোটরযানটি কখন দেওঘর মিশনের মেন ফটকে এসে হাজির হয়েছিল তার খেয়ালও রাখিনি। গেটের দারোয়ান আমাদের কিছু জীজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়ার পর আমরা সোজা সেইসময়কার মিশন সেক্রেটারি শ্রীমদ্ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজের অফিসের সামনে এসে উপস্হিত হয়েছিলাম।

ওনার সঙ্গে গতানুগতিক পরিচিতি পর্ব শেষ করেই আমাকে আমার হবু লোকাল গার্জেন নারায়ণদা নির্দিষ্ট করা হস্টেল বা ধামে নিয়ে চলে আসেন । আমার আগামী দিনগুলোর বাসস্হান হতে চলা সেই ধামটির তাৎক্ষণিক পরিবেশ এবং প্রতিদিনের রুটিন কর্মাবলি যেমন নিজের বিছানা নীচে মাটিতে পেতে রাতে শোওয়া, ভোরে প্রায় পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে নিজের প্রাতকৃত্যাদি সেরেই প্রার্থনাগৃহে গিয়ে প্রার্থনানুষ্ঠানে যোগ দেওয়া এরপর নিত্যকার শারীরিক কসরৎ এ অংশ নেওয়া, খাওয়ার ঘরে গিয়ে নিজস্ব বাসনকোসনে খাওয়া এবং ধুয়ে র‍্যাকে তুলে রাখা, স্কুল ইউনিফর্ম পরে সময়মতন স্কলে যাওয়া সেইসব নিয়মকানুনের ফিরিস্তি শুনে চোখে জল এসে গিয়েছিল ।

খালি মনে হচ্ছিল এই বয়সে নিজের বাড়ির সমস্ত সুখ সুবিধা ছেড়ে আমি কেন এই পান্ডব বর্জিত জায়গায় এসে হাজির হলাম। আসলে ভর্তির পরীক্ষা দিতে যখন প্রথম আমি এই মিশনে এসেছিলাম তখন এই আশ্রমের দুধসাদা রঙের সার দিয়ে দাঁড়ানো বিল্ডিংগুলো, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষরাশিসমূহ, শম্ভু মহারাজের সুন্দর গোলাপ বাগান এছাড়াও স্কুল বিল্ডিং গেস্টহাউসের সামনের কেয়ারি করা বাগান, শাকসবজির ক্ষেত, প্রশস্ত আমবাগান, অনধিক

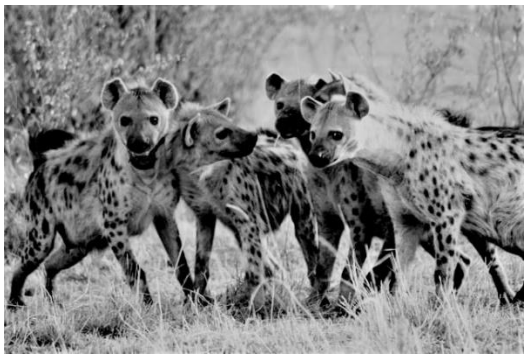

দুশো দুধেল গরুর ডেয়ারি এবং পরিশেষে এগারোটি ছোটবড় সবুজ খেলার মাঠ প্রভৃতি দেখে এতটাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে কবে ভর্তি হয়ে এখানকার সমস্ত সুযোগসুবিধাগুলো ভোগ করা শুরু করে দেব সেই স্বপ্নেই মশগুল হয়ে ছিলাম।

ইত্যবসরে দেওঘর মিশন সম্পর্কে কিছু জরুরি ইনফরমেশন দেওয়ার প্রয়োজন আছে । সমগ্র বিশ্বে রামকৃষ্ণ মিশন বেলুর মঠ পরিচালিত যত আবাসিক এবং ডে-স্কুল নির্মিত হয়ে আছে দেওঘর মিশন তার মধ্যে সবচাইতে পুরাতন । এই শতাব্দী প্রাচীন স্কুলটির বলা ভালো আশ্রমটির দৈনন্দিনের জীবনশৈলী পুরোটাই নিয়মনিষ্ঠ পুরাকালের আশ্রমের ধাঁচে পরিচালিত হয়ে থাকে যার পরিচালনভার সর্বপ্রথম স্বামীজি'র অন্যতম গুরুভাই শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজজী তথা রাখাল মহারাজের উপরে ন্যস্ত হয়েছিল।

অতঃপর মিশনের প্রথম দিনে বাবা মায়েদের সাথেই দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে নিজের ধামে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছিলাম। বিকেলটা এই প্রথম ধানবাদের ছোট্ট বন্ধুদের সঙ্গে না কাটাতে পেরে বেশ মনমরা হয়ে পড়েছিলাম। নতুন বন্ধুদের সাথে আলাপ করে কিছুটা সময় তাদের সাথেই গল্পগুজব করে কাটিয়ে দিলাম। এরপর এলো মিশনের প্রথম রাত মা বাবারা ধানবাদ না ফিরে গিয়ে গেস্ট হাউসেই থেকে গিয়েছিলেন মায়ের মন খারাপের কারণে। রাতের খাবার আটটার মধ্যে খেয়ে নিয়ে নারাণদার অনুমতি নিয়ে নিজের বিছানা নিজে নীচে বিছিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

শরীরে ক্লান্তি থাকলেও চোখে ঘুম কিছুতেই আসছিল না। খালি ধানবাদে থেকে যাওয়া ভাইবোনদের কথা আর রাতে মায়ের পাশে শোয়া নিয়ে খুনসুটি করা এইসব ছবিই মনের মধ্যে ভীড় করে আসছিল । ইতিমধ্যে আমার বিছানার মাথার দিকের বড় খড়খড়ি জানলার মধ্যে দিয়ে হাড়হিম করা অদ্ভুত ধরণের হাসির আওয়াজ আসতে শুরু করে দিয়েছিল । এতে সারারাত প্রায় জেগেই কাটিয়ে দিলাম । পরের দিন সকালবেলায় নারাণদার কাছে জানতে পেরেছিলাম যে ঐ হাসির মালিকরা হোলেন গিয়ে হায়নার দল। ঐ সময়ে দেওঘর মিশনের আশপাশ ভীষণই নির্জনতায় ভরা ছিল। তারই সুযোগ নিয়ে হায়নারা রাতের বেলায় খাবারের লোভে ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ত আর মুখ দিয়ে ঐরকম আওয়াজ করতো।

পরের দিন সকাল হোলো আর আমিও ঠিক করে ফেললাম আর আমি এই স্কুলে পড়ব না। মা বাবার কাছে ভীষণই কান্নাকাটি করে আমাকে ফেরৎ নিয়ে যাওয়ার আর্জিও জানিয়ে রেখেছিলাম। এবার যথারীতি আসরে নামলেন সেই নারাণ দা-ই যার হস্তক্ষেপেই আমি কান্না ভুলে গিয়ে আবার নিজের দৈনন্দিনে কাজে মন হাত দিয়েছিলাম। আমার মা এর মন ভীষণভাবেই খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্যে বাবা-মা দুজনাই নারাণদার অনুরোধে অতিরিক্ত দুদিন থেকে গিয়েছিলেন এবং ঐ দুদিন অনেকটা সময়ই যাতে আমি গেস্টহাউসে বাবা মায়েদের সঙ্গে বেশিক্ষণ কাটাতে পারি সেই স্পেশাল পারমিশনও নারাণদা সেক্রেটারি মহারাজের কাছ থেকে যোগাড় করে নিয়েছিলেন।

অবশেষে দুদিন পর আমার গার্জেনরা বাড়ির দিকে পাড়ি দিলেন আর তারপর থেকেই আমার কান্না হাসির মধ্যেই আশ্রমিক জীবন কেটে যেতে লাগলো । আমি বরাবরই খুব মিশুকে স্বভাবের ছিলাম তাই নিজের ক্লাসের নতুন বন্ধুদের সঙ্গে ভাব ভালোবাসা জমিয়ে নিতে বেশি সময় নিলাম না। ঐ বছরের বন্ধুদের মধ্যে কেবল '৭০ ব্যাচের স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দু মজুমদারকেই মনে হয় সকলে চিনবে । মলয় বসুরায়, স্বর্গীয় সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়রা ১৯৬২ সালে দেওঘরে ভর্তি হয়েছিল আমার যতদূর মনে পড়ছে।

যাইহোক আশ্রম জীবনের পরবর্তী দিনগুলো আমার আবাসিকের কঠোর নিয়মকানুনের মধ্যেই কাটতে লাগলো । এখানকার আশ্রমিকদের সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যাবতীয় কাজকর্ম শৃঙ্খলাপরায়ণতার মাধ্যমে দলবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করাটাই একমাত্র রীতি। এখানে শৃঙ্খলা কোনো বাঁধন নয় এক নিঃশ্বাসের উন্মুক্ত আকাশও বর্তমান। অল্পদিনের মধ্যেই আমেরিকান মহারাজ বা শম্ভুদা, হেডমাস্টার মহারাজ বা হৃষিকেশদা, কালিপদদা, চন্দনদা, কানাইদা, চন্ডীদা, রামদা, বিদ্যুৎদা প্রভৃতি মহারাজ ব্রহ্মচারী তথা শিক্ষকদের সংস্পর্শ লাভ করলাম। এইসব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বদের ছত্রছায়ায় নিজেকে পড়াশোনা, খেলাধূলা এবং নানান কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তৈরি হতে থাকলাম।

সারাটা বছর লেখাপড়া ছাড়াও আঁকা, গানবাজনা, নাটক, শরীরচর্চা, খলাধূলাতে নিজেকে নিয়োজিত করে পারদর্শী হতেও পিছপা হলাম না। সপ্তাহান্তে আউটিং আর কখনো সখনো কোনো গরমকালের রবিবারে আম পাড়ার ঘন্টা পড়াটাও নিত্যনৈমিত্তিক রুটিনের মধ্যেই ছিল । এইসব কার্যকলাপের মধ্যে থাকলে শারীরিক কাম মানসিক বিকাশ হাতে হাত ধরে আসে। আউটিংয়ের প্রিয় জায়গাগুলো ছিল নন্দন পাহাড়, তপোবন, ত্রিকূট পাহাড়, মধুপুর প্রভৃতি । আমাদের দিনের শুরু এবং শেষটা সমস্বরে ভাবগম্ভীর প্রার্থনাগীতের মাধ্যমেই হতো এরসঙ্গে আরত্রিক ভজন গাওয়াটাও প্রতিদিনের একটা রীতির পর্যায়ে পড়ত।

প্রথম বছরেই আমার একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে যায়। পুজোর ছুটির ঠিক পরেই যখন সব আবাসিকবৃন্দ অ্যানুয়াল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দেয় তখনই আমি সিভিয়ার জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। রোগটি সংক্রামক এবং সঠিক চিকিৎসার মধ্যে না গেলে রুগীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে। তাই মিশন কর্তৃপক্ষ এবং আমার বাবার মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে আমাকে বাড়িতেই চলে গিয়ে সেখানে থেকেই বাবার আন্ডারেই চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়েছিল। নির্দিষ্ট একুশ দিন অতিবাহিত করে যখন পথ্যের মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠছি তখনই আবার রোগটির রিল্যাপস হয়।

এই দীর্ঘ সংক্রমণের কারণে আমার শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই আমার বার্ষিক পরীক্ষায় বসা হয়ে ওঠেনি। সেক্রেটারি এবং হেডমাস্টার মহারাজদ্বয় আমাকে ক্লাস প্রোমোশন দিতে রাজিই ছিলেন কিন্তু বাবা ছেলের পড়াশোনার ভিত সুঠাম করার লক্ষ্যে আমাকে একই ক্লাসে আর একবছর রেখে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন কি আর বুঝতাম এক বৎসর বেকার চলে যাওয়া জীবনের কেরিয়ারের পক্ষে কত ক্ষতিকর । আমাকে দেওঘর মিশনে ভর্তি হতেও একটা বছর খেসারত দিতে হয়েছিল বয়সজনিত কারণে। এরপর মিশনে আবারও চার এর গেরোয় পড়ে আর কপালের ফেরে পড়ে বছর নষ্ট করতে হয়েছিল । অর্থাৎ ভগবান আমাকে চতুর্থ শ্রেণীতে পরপর দুবছর রেখে জীবনের ভিতটা শক্তপোক্ত করে দিয়েছিলেন ।

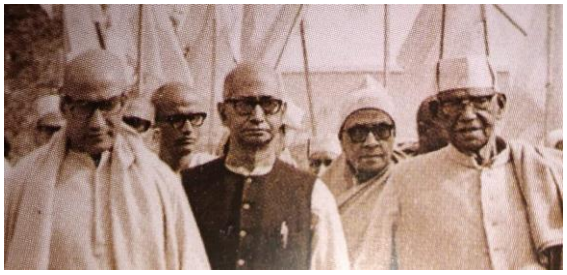

দেওঘর মিশনের যে খ্যাতি সারা বিশ্বের মধ্যে শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছে সেটা হলো গিয়ে আশ্রমের আবাসিকদের চারবেলার উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য ব্যবস্হা । এই ছাত্রাবাসে বসবাসকারী ছাত্রপ্রতি একটি করে দুধেল গরু পালন এই মিশন কতৃপক্ষ করে থাকেন, ছাত্রদের তিন বেলা দুধ দই ঘি মিষ্টান্ন খাওয়ানোর স্বার্থে। এখানে পাঁঠা বা খাসির মাংসের পরিবর্তে ভেড়ার মাংস তথা মাটন রান্না করে পরিবেশিত হতো। টাটকা শাকসবজির বিশাল বাগানই জানান দিত এখানকার নিরামিষ খাদ্যসামগ্রীর ভ্যারাইটিস পদতালিকা। সত্যি কথা বলতে কি দেওঘর মিশনের খাদ্যাভ্যাস আমাদেরকে সুস্হসবল রেখে ছিল। আমার দেওঘরে ১৯৬১, '৬২, '৬৩ এই তিন বছরের আবাসিক জীবন আমাকে যারপর নেই আনন্দ দিয়েছিল ।

দেওঘর আবাসিক জীবনের শেষ বছর অর্থাৎ ১৯৬৩ সালের মাঝমাঝি সময় হাফ ইয়ার্লির রেজাল্ট বেরোনোর ঠিক পরেই আমাদের গার্জেনদের কাছে সেক্রেটারি মহারাজ হিরণ্ময়ানন্দজীর একটি প্রস্তাব সম্বলিত আবেদন পত্র পৌঁছলো। তাতে যা লেখা ছিল তার মর্মার্থ হলো এই যে আগামী ১৯৬৪ বর্ষ থেকে দেওঘর মিশন এবং পুরুলিয়া মিশন দুটি পৃথক আইডেন্টিটি নিয়ে পৃথক পৃথক বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হবে। দেওঘর মিশন সেন্ট্রাল বোর্ড আর পুরুলিয়া মিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড এই ব্যবস্হাপনায় ছাত্রদের গার্জেনরা তাঁদের সন্তানদের যে বোর্ডের আন্ডারে রেখে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পছন্দ করবেন তা সত্বর বেলুড়মঠ কতৃপক্ষকে জানাতে।

১৯৬৪ বর্ষেই যারা পরিবর্তন চেয়ে আবেদন করবেন তাদের সন্তানদের কোনোপ্রকার ভর্তির পরীক্ষায় বসতে হবে না, সেটাও পরিষ্কার করে তাঁরা জানিয়ে দিয়েছিলেন । পুরুলিয়া ধানবাদের পাশেই ৫২কিমি দূরত্বে সুতরাং যাওয়া আসাও খুবই সুবিধাজনক হবে, এই ধারণা নিয়েই আমার বাবা আমাকে পুরুলিয়াতে ট্রান্সফার করিয়ে নিতে সম্মতি জানিয়ে পত্র ছেড়ে দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে পুরুলিয়ার যাবতীয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে আমাদেরকে বরণ করতে তৈরী।

দুই মিশনের স্হাপত্যশৈলী একদমই ভিন্ন। দেওঘর একটু পুরাতন শিল্পরীতির ছোঁয়ায় তৈরী পুরুলিয়ার স্হাপত্যশৈলীতে সেখানে আধুনিকতার ছোঁয়া। যেটা উল্লেখযোগ্য তা হলো ধাম বা হস্টেলের অন্দরেই পায়খানা বাথরুম । স্কুল বিল্ডিং, হস্টেল, লাইব্রেরী, ডাইনিং হল, অ্যাসেমব্লী হল, সবেরই স্হাপত্যে রাজস্থান শিল্পরীতির ছোঁয়া। এই নতুনভাবে নির্মিত পুরুলিয়া মিশনের সাদর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি বাক্স বিছানা আর আমার পুরো পরিবারকে নিয়েই মিশন চত্বরে বুক ফুলিয়ে প্রবেশ করেছিলাম। এখানে সকলেই আমার পূর্ব পরিচিত যে । মহারাজ শিক্ষকদের পুরো দঙ্গলই পুরুলিয়াতে উপস্থিত ।

আজ বেলাশেষে এই পরিণত বয়সে অবসর সময়ে যখন ঝরা পাতার মতন উড়ে যাওয়া দিনগুলো স্মরণে আসে তখন মনে হয়, মিশন বিদ্যাপীঠের সকল সন্ন্যাসীবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ এঁরা ব্যতিত অন্যান্য সকল অবিভাবকবৃন্দও আমাদের যথেষ্ট ভালোবাসা মিশ্রিত শাসন ও স্নেহদানের মাধ্যমে আমাদেরকে জীবনে আদর্শবান নিষ্ঠাবান এবং প্রতিষ্ঠিত পুরুষ হিসেবে সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। এই ঋণ পরিশোধযোগ্য নয়। সেই স্নেহমাখা মুখ এবং হাতগুলোর পরশ এখন আর কোথায় পাবো ।

জয়ন্ত বিশ্বাস

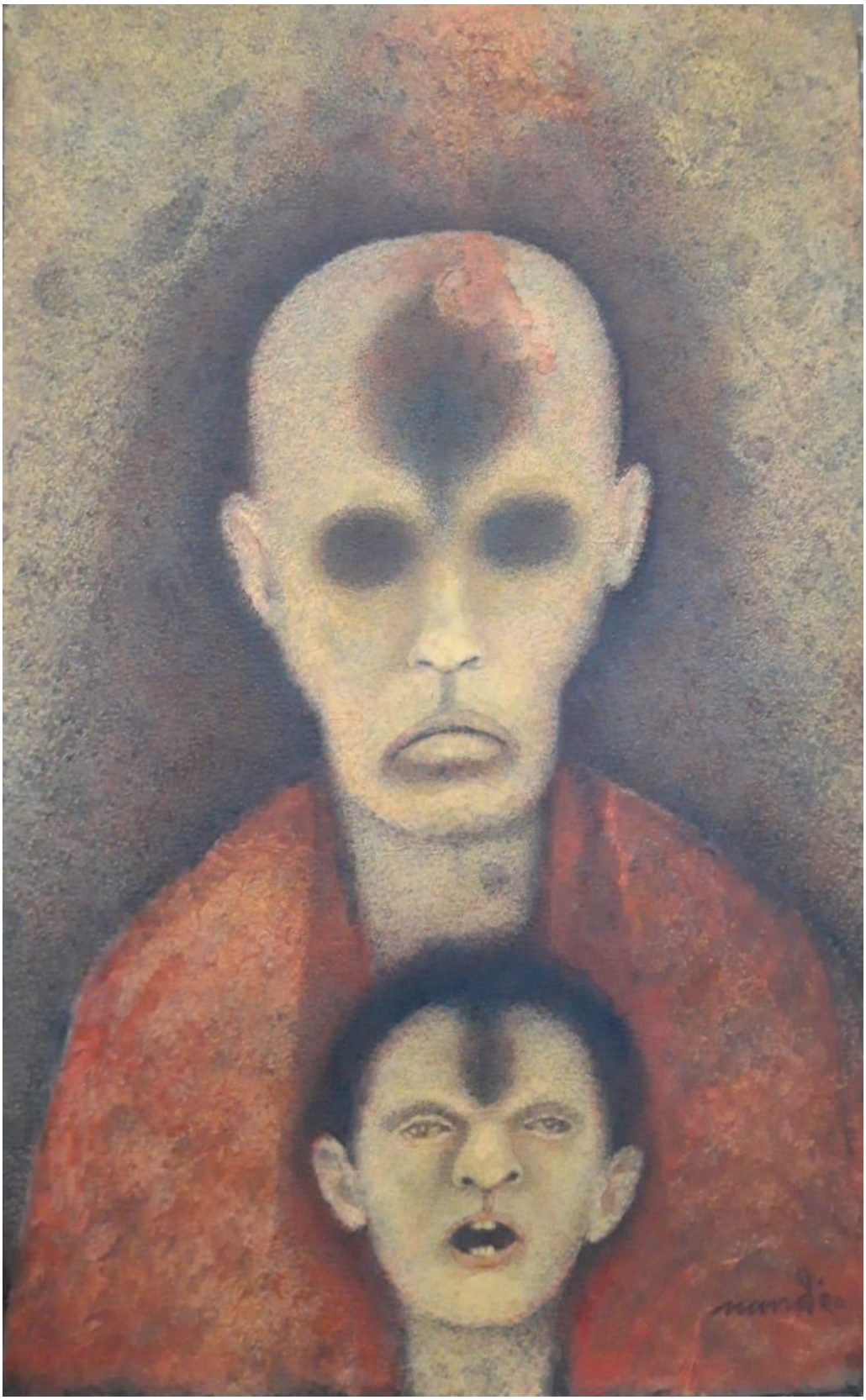

Goodbye, friends, Goodbye (Bidayee -- Bandhu-- Bidayee)

It was ten o clock in the morning, and two buses were parked in front of our hostels. By that time, we had had our lunch. As soon as the bus arrived, we started loading our bags and baggage. Within half an hour, we completed the job. Then we got into the buses, platoon-wise. Our commanders took the attendances, and we started our journey.

The name of our school was Ramakrishna Mission Vidyapith, Purulia. Students from all over India study here. The mediums of instruction were both English and Bengali.

In Vidyapith NCC was compulsory. There were four platoons in the higher classes and four platoons in the lower classes. Every year the senior platoons were taken to a distant, lonely place for three days for enjoying camp life. The platoons' names were Pratap Platoon, Shivaji Platoon, Vivekananda platoon, and Subhas platoon. Every platoon had a Commander, and there were two teachers in charge. They were called the Physical Instructors.

That year (1969, February), our campsite was on the bank of the Damodar river at a very lonely place in Bihar. There were four old abandoned military barracks on the site.

We reached the place at about 3 pm. As soon as the buses arrived there, all of us noticed three words written in black bitumen on the wall of a barrack in the Bengali language, " --- Bidayee-Bandhu-Bidayee" (Goodbye -Friends- Goodbye). Our minds were not prepared to notice such types of words just at the arrival.

Anyway, we got down from the buses and occupied the respective barracks allotted to us. A team of cooks from the Vidyapeeth accompanied us.

Within half an hour, they prepared tea for us. A temporary kitchen was built up near our barrack. As the bell rang for tea, we all assembled in front of the temporary kitchen. After a long bus journey, we enjoyed hot tea and biscuits and felt relaxed.

It was half-past five. The sun had already arrived at the west corner of the sky. Still, there was some time left for the evening prayer. So, few of us walked towards the main road passing nearby our site. There was a vacant place towards the south of the barracks stretching about 50 meters. The Damodar river was flowing after that empty place.

We were walking towards the west by the main road. One thing we noticed was that there was not a single house nearby. The area was lonely. But we had come across some strangers on our way. From them, we came to know that about 1km away there is a village. Dhanbad was about 30kms from our campsite.

As it was the time for prayer, we returned to our barracks. In the meantime, the temporary prayer hall was made ready for worship. Just like in our Vidyapith, here also we had our prayers. After that, we took a rest in the respective barracks till our dinner time at 9.00 pm.

On the second day in the camp, we started our camp life with prayer at 5 am. Till 11.30 am we were busy with various programs of the camp life. At noon, we were allotted 30 minutes for taking a bath.

For this purpose, we went to the Damodar river, which was flowing near our barracks. Nearby the riverbank, the depth of the water level was about three to four feet. We felt that at least up to twenty feet wide, it was safe to swim. Many of us could not swim. So they were enjoying themselves near the bank. Those who could swim swam up to 20/30 feet away from the river bank. All of us were enjoying ourselves like ducks in the water.

As per the rule of the camp, few cadet crops were on security (sentry) duty in and around our campus.

After about 20 minutes of swimming, we were ready to get out of the water. Just at that time, one of our security boys came there. He was looking for Biswajit, a student of class XI. Biswajit's father was an engineer in Dhanbad Mining. He heard that his son was camping near his workplace, so he reached the place to see him.

But alas! We could not trace Biswajit there. Many of us shouted for him. But in vain. It just echoed back only. Suddenly someone noticed the towel and sandal of Biswajit lying on the bank. The sighting of his belongings made us suspicious. Biswajit might have been drowned.

Some fishermen were fishing nearby in the river. They could guess something wrong had happened to us as there was shouting for help among us. Many of us shouted "Biswajit, Biswajit". But the call echoed back from the barracks.

In the meantime, the fishermen started searching for a drowned body in the river. After a while, they recovered a body and brought it to the bank. We were surprised when we saw that the boy was Manabendra Sarkar. He was at that time senseless. As first aid, two/ three boys were trying to get water out from his stomach by making him lie down on his belly and pressing on his back, as is done in the case of drowned people.

But we were searching for Biswajit. So, the fishermen again started their job. This time, to our surprise, they dragged out a body from under the water that belonged to Gyaneswar Singh. I could not believe that Gyaneswar, who was an excellent swimmer, could be drowned. Only a few minutes ago, I swam with him to the middle of the river. Gyaneswar was from Manipur.

Where is Biswajit? No, again, to our surprise, they recovered Asoke Parida's body. He was a boy from Odisha. Then the fishermen recovered the fourth person. It was Falguni Sarkar.

After that, we could find Biswajit.

Our Physical Instructor Sushil Ghosh da advised the Platoon Commanders to take the attendance of all the cadets. Pratap platoon's commander Amitava Neogi was himself missing. All of us shouted "Amitava, Amitava", but it echoed back to our ears. We could not trace him within the campsite. Again, the fishermen were engaged to search for Amitava. Finally, after searching for few minutes, his unconscious body could be recovered from under the water. In the meantime, the authorities managed to get an ambulance. In no time, all the six boys were shifted to a hospital in Dhanbad.

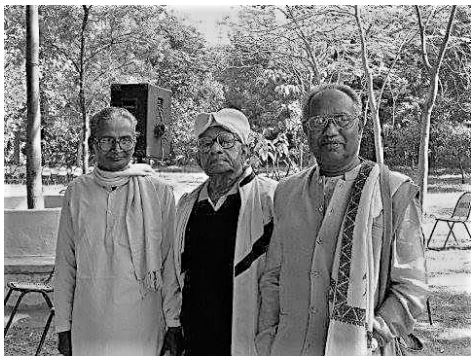

The whole area had pin-drop silence. Anybody could hardly talk. Our beloved Kalipada da (our chief warden) and the teachers present there became mad. Our Secretary Maharaj (Chandan da) was so disheartened and nervous that he could not drive the car to accompany the ambulance though he was sitting in the driver's seat. So, some other person had to drive the vehicle.

Suddenly Durgada (our chemistry teacher, who also accompanied us) started to cry so loudly that none of us could hold our tears. Everybody was weeping. The entire site became sorrowful.

It was 2 pm. All of us were lying in our respective beds silently. Lunch was ready long back. Nobody had the mood to take a meal. Among the cooking party, there were two elderly persons. They consoled us, telling us that everything would be alright by the grace of Thakur. We should have our food. Though not convinced with their advice, few of us took some food. But a large number of boys did not even touch the meal.

It was 4 pm. We were sitting in front of our barracks, almost holding each other. We were waiting for our rescue.

At about 4.30 pm, Susanta Sarkar, a class XI student, hurriedly arrived our spot to inform the most tragic news "all were dead". Susanta accompanied the drowned boys in the ambulance to Dhanbad.

Hearing this news, Sushil Ghosh da, who was sitting near us on the grass, cried so loudly that we started weeping again.

It was 5 pm. Suddenly, the whole sky became black with cloud cover. The wind started blowing. Within few minutes, the rain started heavily. The entire area was submerged in darkness as the electricity went off. The atmosphere became dreadful. We prayed to God to save us from further harm.

After 30 minutes, the rain stopped. The lights came back, and we noticed that all boys' eyes still had tears. Everybody became dumb.

At about 6 pm, two buses from Purulia arrived at the campsite. We were very much eager to leave the place as soon as possible. Within half an hour, we got on the buses. Attendances were taken for the remaining boys. After getting the signal from our physical instructor, the engines of the buses roared.

As soon as the headlights were on, the three calamitous words again came to our notice. We closed our eyes till the time so long the buses could leave that place.

Ramesh Chandra Sarma

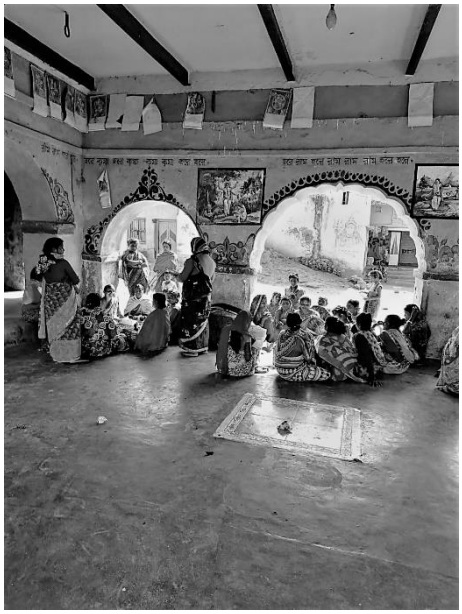

The Saviour

(The Arduous Journey of three Kilometres)

It was the winter months of early 1964. The village boys were, as usual, playing in the field in their own ways, soaking in the sun -- some flying home - made kites with thread tied in stick -- some throwing from the improvised bows, arrows made from sugarcane straws, high in the sky.

Suddenly, the maternal uncle of this rustic boy appeared in the village from the nearby Purulia District Town. And broke the news amongst the villagers that this boy had stood 4th in the District Level Primary Board Examination.

This boy remained oblivious of what has happened, as usual.

A little background!

In the District Purulia, there was the system of Board Examination at the end of Class IV. Maybe it was the system throughout West Bengal. One day, at the end of 1963, our Primary School Teacher Shibdas Bandopadhyay took all the boys of class 4 to Purulia town, kept us in a Dharmashala near Saheb Bandh. This was this boy's first experience of community living. All the boys would study in the evening and in the dawn in the lantern light brought by all. And appear in the Exams. in the nearby Zilla School of Purulia town. What an enthralling experience of writing exams with beautifully coloured Question Papers on all the days of Examination.

While the early morning sun was shining radiantly, suddenly black clouds appeared in the horizon. Black clouds in the family fortunes of this young boy -- which he was unable to comprehend. Within a span of 3 years between 1963 & 1966, all the landed property of the family -- producing about 100 maunds of paddy -- had gone -- sold out. Our family business --- a flourishing grocery shop -- collapsed. And we became virtually paupers.

In this scenario, when all these things were happening, the headmaster of our village school --- Chharra Junior High School -- Revered Kartick Chandra Maji -- a man belonging to our own village -- took interest in this boy, and asked him to appear at the District Level Class 6 Merit Scholarship Examination.

On the scheduled day in the year 1965, this boy appeared in the Exam, held at Rajasthan Vidyapeeth, Purulia town, without being escorted by anyone.

The dream of our Revered Headmaster -- Kartick Chandra Maji --- came true. This boy again stood 4th in the Exam at the District Level. Fetching him a monthly stipend of Rs 5 / for the classes VII, VIII, IX and X. Earlier the scholarship at class IV fetched him a monthly stipend of Rs 3/ for classes V and VI.

This boy remained oblivious as usual, reticent as he was with everything. And continued his studies at the village school.

But the clouds in the family horizon became darker day by day. And this boy had to abandon his studies and go to a distant school to sell tiffin items to the students to earn some money.

But it's said, every cloud has a silver lining behind it.

Suddenly, without any notice -- without any prelude -- a New Sun -- yes, a New Sun -- appeared in the life of this boy --- Ram Kinkar Mandol -- the Pradhan of the village.

He took it upon himself that this 'brilliant ' boy had to be admitted in the 'Mission' School.

Being a Congress Party Leader himself, and having close relationship with the District Level Congress functionaries like Dr Tarapada Roy of Purulia town, who was a renowned doctor in the whole district, he took it as a challenge. He contacted the District Officials, apprised them. Aa all this was going on, with the boy remaining ignorant about everything.

On his advice, this boy applied for class VIII admission in the Mission School, and appeared in the Admission Test.

Meanwhile, the boy' s father was on the death bed. And his work of selling tiffin at a distant school every day, and abstaining from school had its natural effect on the Admission Test results of the Mission School.

The boy naturally couldn't fare well in the Admission Test. The Mission Authorities were reluctant to admit him. But Ram Kinkar Mandol also was adamant. On his instruction, this boy obtained 'Recommendation' letters of district functionaries like BDO, SDO etc. of Purulia town.

All these favourable letters were shown to Chandan Maharaj -- Swami Chandrananda -- The Secretary of the Mission.

After a lot of persuasion from different quarters including the meeting of the widowed mother of this boy with Chandan Maharaj -- the Secretary Maharaj finally relented.

But he put a stringent condition -- the boy must obtain 1st Division marks at the very next examination; otherwise, he would be thrown out. A condition that the boy readily accepted without understanding at all its deep significance and possible implications.

Thus, the Journey of Three Kilometres started!

It is a great opportunity for me to express my respect and deep gratitude to those departed souls -- the teachers of my Village School -- and the big-hearted Pradhan of my Village -- Ram Kinkar Mandol who guided me in those difficult days.

And of course, my mother who underwent difficult pain and waited for long ten years before this boy could firmly stand by her side.

And of course, it would be unbecoming of me if I don't express equal respect and gratitude to Swami Chandranandaji Maharaj who ignited my mind by putting the difficult condition.

And the large number of teachers of The Mission School, and the brilliant boys of my own class who moulded my life in silence.

At the near-end of the journey, I pay my sincere gratitude to all!

Jay Narayan Sao

Gentle waves of memories

After a long journey of more than about 60 years, that started from RKM Vidyapith, Deoghar, the memories are still as fresh as if it all happened just the other day. My schooling started from RKMV Deoghar, class IV till class VI. Class VII to part of class XI, the major part of schooling at RKMV Purulia, and the finishing at RKM Ashram, Asansol.

Our friends´ initiative and subsequent follow-up is truly commendable, you know why? - seeing myself - trying to key in and give some material to the editor to work on. I thought of putting down some of my good old memories. I will put them in a rather random fashion, not following any order, chronological, or whatever.

At Deoghar Vidyapith, we did not have cots in our dham. Every day we had to bring our bed roll from the bedding room at night, fix the mosquito net and in the morning at about 5:30 am, put it back in the bedding room in proper rolled and tied condition. For days in and days out, the same routine, but I never recall that ever anybody had any issue with the routine. Mind you we all were 7 to 8 years old.

I remember vividly the first day at tailoring class at Purulia Vidyapith. We had our first encounter with technology - our teacher Modak-da started the class with "Tailoring is the father of technology ". Today when I look back, I really can see that it was our first hands-on encounter with technology. Much later similar technology was applied to do nesting on steel plates in shipyards. The objective was the same, minimum wastage of material, be it cloth or be it steel. Today computer-driven nesting is done in shipyards, similar technology, I believe, is also used in garment factories.

We got our first taste of tomato ketchup way back in 1963 at RKMV Deoghar. There were two American teachers, Mr. Chandler and Mr. Bradley. They used to have their breakfast, etc. in a separate dining room, with few tables and benches. One day we entered that room and found a bottle in the wall wardrobe having some kind of red stuff in it. We had no idea, what it could be, but thought must be something edible. We just took a little bit on our palm and tasted it. It was simply brilliant for us. The next day we came equipped with an empty bottle and you can understand what we did. That was our first encounter with tomato ketchup.

We were in Jogananda Dham, during Holi in the year most probably 1969, we had a great day enjoying with Abir and water. In the afternoon, Srikanta came into our room with a matchbox in his hand. There were few strands of hair in it. Can you imagine what it was? While playing with abir, Srikanta very quietly managed to chop off the 'Choitanya' of a Brahmachari Maharaj and kept it in that matchbox. I forgot who was the unfortunate Maharaj. I also don't know where Srikanta got the matchbox in the first place.

It became more or less a daily practice for Srikanta to come to our room for chitchat after dinner. He used to be dressed in a very long Panjabi. One day Suranjan pointed out, "o beta niche kichu pore na, opore panjabi ta pore ase". One day as Srikanta landed in our room, Suranjan went over to pull up his Panjabi and Srikanta ran out of the room, Suranjan chasing him, and they were out of the Dham running on the road. Imagine the scene, Srikanta running and his Panjabi flying in the air.

I am sure, we all fondly remember Snyder (Martin Brad Snyder). One day Snyder came to the class with a coil of a thick rope hanging from his shoulder. In the previous class, he talked about different kinds of wave propagation. He tied one end of the rope at the window and held the other end at a distance and gave a jerk to the rope. A nice sinusoidal wave travelled down the rope and returned from the tied end forming the so-called standing wave condition. With this simple experiment, he explained the phenomenon of standing wave. Simply excellent.

Snyder sowed the seed of interest in electronics in me and the result was, we used to hear radio peaking in my home brewed radio while staying in Saradananda Dham. Eventually, I made a 3-band radio while at IIT, used to tune in to radio Ceylon to Amin Sayani's programme of Hindi songs. This interest in electronics went a long way as a hobby and is present even today.

One day I and Manas landed in his room. There, on the table, we saw a photograph of Snyder and a lady. Manas promptly asked, "Is she your lefty?" I didn't know then what lefty means. Snyder gently replied, "No, my sister".

While in Asansol, we had permission to go out for a walk around in the afternoon. One day we got a packet of cigarettes, ten of us each having one and one of us trying to light his cigarette. Unfortunately, he used a lot of matchsticks, one after another, but could not light his cigarette. Two girls were passing by, they commented, "mone hochhe notun cigarette khete sikheche".

In September 1970, I was at home. My father returned from Belur Math. As he entered the house, he gave me an envelope and said, "jao school khuje nao". I had quick lunch and went out, headed for RKM Ashram, Asansol. I knew they had technical stream, not many schools had the stream. Fortunately, or unfortunately, I was in the technical stream. Also, I knew, Chandanda was the secretary there. I landed in his office, seeing and hearing from me what my father said, he coolly said, "besh korechen". But immediately enquired what others are doing. He then told me, "jar jar thikana ache sobaike chitti lekh, ekhane aste bol .....". Ten of us landed there and could appear for our higher secondary exam from there. All of us did very well and some did exceptional in the exam. I so fondly recall Chandanda, had he not been there, I am not sure where I would be today.

We landed at RKM Ashram, Asansol sometime in Sept/Oct 1970. From the school, we were assigned, two teachers. Dhanapati babu took care of our English and Bengali while Sukumar babu helped us with Physics & Chemistry. We did have wonderful teachers at Vidyapith, but let me tell you, we were blessed to have Dhanapati babu and Sukumar babu helping us in our studies in those difficult days. We never attended regular classes at Asansol, they used to come to our hostel and teach us. I remember it was Christmas Eve, Dhanapati babu took us to a nearby restaurant and served us cake to celebrate Christmas Eve. Both of them had a wonderful sense of humor. Taking lessons from them used to be real fun. But mind you, our higher secondary results are evidence of their teaching ability and the academic care they took of ours.

Aren't you all thinking about what happened to Mathematics? Well, that is another great story of a great teacher, I ever came across. That's Perumalda. Probably, sometime in November 1970, Chandanda told us Perumalda will be coming during the winter vacation. Perumalda of his own came down to Asansol RKM Ashram in December 1970, stayed for almost the whole month in the guest house, and completed our Mathematics course. It was he, who took the initiative, nobody told him or invited him, he came of his own, stayed of his own, possibly

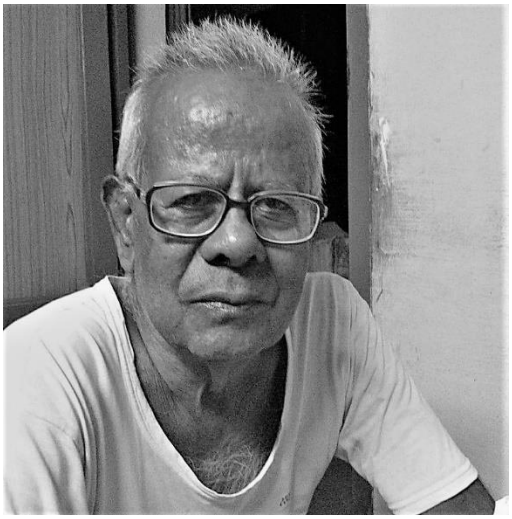

Chandanda waived his guest house charges and as I know, there was no question of any kind of payment from our side too. He told us, "I came to know ten of you are here, so I thought why not complete the remaining portion of the syllabus for these ten boys at least, whom I am getting at one place". He even came to see us at IIT Kharagpur in our 1st year. That is Perumalda, salute to him.

We were in the 4th hostel, interestingly, it was called '4th hostel' and not some Dham, as the other hostels were named. We were in class XI then, one day in the dining hall, I had some tiff with one of the serving boys and out of anger and sign of protest, I left the dining hall without taking my lunch and returned to the hostel. I used to sit at the extreme right table, just after that the door and besides that a table where Sushilda and others used to sit. Anyway, after that, as I was l leaving for class, you may recall Sushilda's room used to be just beside the entry/exit door of the hostel. To my great surprise, I found Sushil da standing with a 'bati' full with 'doi and bhat' and a spoon. Almost tears rolled down from my eyes, he quietly told me "eat this" and then added, "Whom you are showing anger, is your mother here, who will take note of it, the only thing you will get is, you will go hungry .....". Now I realize that at that moment my mother was standing right in front of me.

It was Aug.1970, we all gathered in front of Secretary Maharaj, Dhirenda’s residence sometime in the forenoon. At one point, I lost my cool and uttered one of the very shameful sentences in my life, "you are telling a lie Kalipadada". I met Kalipadada exactly after a gap of 33 years at Balaram Mandir. As I stood after pronam, I asked, "Kalipadada, chinte parchen?" He looked up and instantly said "Provat". Provat is my elder brother, I said, no. To my utter surprise, he immediately said, "Nisith". I could not believe my ears, after a gap of 33 years, not only he recognized me, he also remembered my brother. My eyes became wet, I can't express, how I felt. It stems from the selfless true love that they had for us.

I think I have put enough for the Time Being. Memories are like gentle waves in a vast ocean, they continuously keep rising and fading away.

Nisith Ranjan Mandal

Forest of Billund

Come and walk with me in the forest of Billund,
Wondrous beauty the earth has bestowed
A surreal splendor that surrounds us
Just listen to the nature, composing the symphony.

Amidst the sound of whispering trees,
Tinkling of the burbling streams
My tornado mind, keeps wondering
deep into a poet's lovely dreams.

Let's walk where sunlight sets forest leaves glow
in open paths where golden light stays below
Trees shading all from summer heat,
making restless mind embrace the nature.

Rest beneath the golden embers of autumn tree,
the wonder, many come to see
Colorful leaves gliding down in a whirling course
and the embers breaking out from a tiny rose.

The winter forest makes my desolate place
standing strong side by side in melancholy
I wish to gaze at you all along while you are quietly asleep
till the dawn of the forest of Billund makes a wakeup call.

Manas Roy

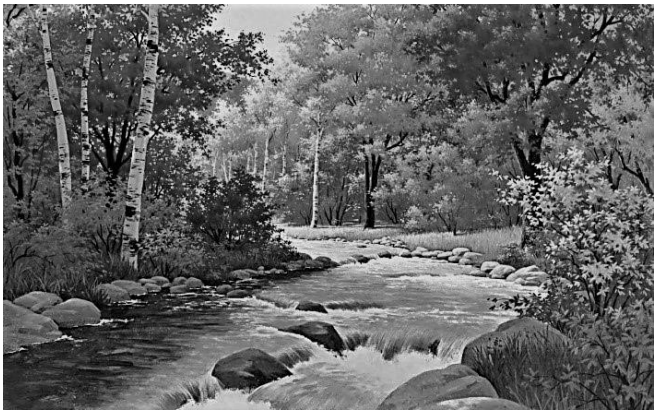

স্মৃতির অতল থেকে

আমরা ভাইবোনেরা ছোটবেলায় বাবার কর্মস্থল সীতানালা কোলিয়ারি তে ছিলাম। এটি তৎকালীন বিহার রাজ্যের ধানবাদ জেলায় ছিল। বর্তমানে তা এখন ঝাড়খন্ড রাজ্যের মধ্যে পড়ে গেছে। কোলিয়ারি তে কোন স্কুল ইত্যাদি ছিল না। সে সময়ে কোলিয়ারি গুলি প্রাইভভেট মালিকানাধীন ছিল। ফলে, আমাদের বাইরের বোর্ডিং স্কুলে পড়াশোনা করতে হয়েছিল। আমরা দুই ভাই , আমি আর শান্তি ১৯৬৩ সালে পুরুলিয়ায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে ভর্তি হই। দুই বছর পরে আমার ছোটভাই গোপাল ক্লাস ফোরে ভর্তি হয়। প্রথমদিকে ক্লাস ফোর ও ফাইভ মিলে আমরা ৩৫ - ৪০ জন ছাত্র ছিলাম। একসাথে হোস্টেলে থাকা , স্কুলে যাওয়া , খেলার মাঠে যাওয়া , সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরের আরতি আর গান গাওয়া এসব নিয়ে আমাদের কমিউনিটি লাইফ ছিল ছোট হলেও বেশ উপভোগ করতাম।

ওই সময়ে মিশনেরর সেক্রেটারি ছিলেন শ্রদ্ধেয় স্বামী হিরন্ময়ানন্দ জী মহারাজ। স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন স্বামী বিষ্ণুচৈতন্য মহারাজ , সন্ন্যাস নেওয়ার পর তার নাম হয় স্বামী রমানন্দপুরী। স্বামী পুতানন্দ জী মহারাজ যাকে আমরা কালিপদ মহারাজ বলতাম তিনি ছিলেন আমাদের হোস্টেল সুপার। এমন অত্যন্ত সহজ সরল মানুষ আমি আমার জীবনে কখনো দেখিনি। শিক্ষকদের মধ্যে সুশীল রায়দা, রামানন্দ দা ,সব্যসাচী দা দিবাকরদা , সত্যহরি সাহাদা, ইত্যাদি আরো অনেক শিক্ষকদের পেয়েছি। খেলা ও শরীর শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন সুশীল ঘোষ দা ও পাঞ্জাবী সর্দার জী।

এই স্মৃতিচারণায় আমি কয়েকটি বিশেষ ঘটনায় উল্লেখ করবো যা আমার মনে এখনও সতেজ হয়ে আছে। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ অসাধারণ ভাষণ দিতে পারতেন। উনি মাঝেমাঝে রাত্রের খাওয়ার পর আমাদের হস্টেলে আসতেন। আমরা কেমন পড়াশোনা করছি ইত্যাদি খোঁজ নিতেন এবং ঠাকুরের জীবনের নানান ঘটনার কথা আমাদের শোনাতেন। যাবার সময়ে উনার টেপ রেকর্ডার থেকে সব্যসাচীদার গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়ে যেতেন।

একদিন গ্রীষ্মের দুপুরে আমরা কয়েকজন বন্ধু কাঁচা আম পারবো বলে ঠিক করেছি। আর সেদিন ছুটি ছিল। দুপুরে হোস্টেলে থাকার কথা। আমরা বেরিয়ে খেলার মাঠের শেষ দিকে জিমনাসিয়ামের পেছনদিকে গেছি সেখানে একটা বড় আমের বাগান ছিল, প্রচুর আম ধরেছ, ঢিল মারছি কিন্তু আম পড়ছে না। একজন আমাদের মধ্যে থেকে কেউ বললো একটা আধলা ইঁট নিয়ে দুই হাত সোজা করে আমের থোকায় মার, ঠিক পড়বে। একজন তাই চেষ্টা করলো ,যেই ওপরের দিকে ইঁট ছুঁড়েছে তার সোজা না গিয়ে ওর মাথার ওপর দিয়ে পিছনে গিয়ে খেলার ঘরের কাঁচের জানলায় গিয়ে লেগেছে। বড় একটা কাঁচের জানালা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চৌকিদার এসে আমাদের ধরে ফেললো। আমরা তার পায়ে ধরে বললাম ছেড়ে দিন। সে বললো , আপনাদের ছেড়ে দিলে আমার চাকরি যাবে। বলে, সে আমাদেরকে বড় মহারাজ (হিরণ্ময়ানন্দ জী)র কাছেনিয়ে গেল।

মহারাজ দুপুর বেলা তাঁর ঘরে বসে কিছু পড়ছিলেন। চৌকিদারের কাছে সব শুনে বললেন ,'আম খেতে ইচ্ছে হয়েছে আমাকে বললেই পারতে, আমি আম পাঠাতাম '। এরপর চৌকিদার কে বললেন এদের হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে এসো। আমাদের সেই সময়ে যিনি ওয়ার্ডেন ছিলেন তিনি ঘুমিয়েছিলেন, তাঁকে ডেকে আমাদের হোস্টেলে ঢুকিয়ে দিল। উনি ঘুম চোখে আমাদের খুব পেটালেন। আমরা যে যার রুমে চলে গেলাম।বিকেলে দেখি উনি চলে যাচ্ছেন এবং বিকাশ দা নতুন ওয়ার্ডেন এলেন।

১৯৬৮ সালে পুরুলিয়া অঞ্চলে বিরাট খরা হয়েছিল। আশপাশের গ্রামের লোকজন খেতে পাচ্ছে না , জলাভাবও দেখা দিল।মিশন থেকে রিলিফ ক্যাম্প করে জায়গায় জায়গায় তৈরী খাবার ইত্যাদি দেওয়া শুরু হল। হিরণ্ময়ানন্দজী একদিন প্রেয়ার হলে এই খবর জানালেন এবং বললেন চলো আমরা উপোস করি। আমাদের ঐ দিনের রেশন কিছু জামাকাপড় যা তোমাদের ছোট হয়ে গেছে তা কেচে পরিষ্কার করে হোস্টেলে জোগাড় করে রাখো। এক রবিবার আমাদের ঐ দিনের রেশনের চাল ভাল আনাজপাতি ট্রাকে তোলা হোল। আমাদের পাঁচ জন করে গ্রুপে ভাগ করে কিছু কুপন দেওয়া হল । বলা হল তোমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রতি বাড়িতে কতজন বয়স্ক পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চা আছে তা ঐ কুপনে লিখে দিয়ে ঐ গৃহের যিনি কর্তা বা কর্ত্রী তাঁর হাতে দিয়ে বলবে যেখানে রিলিফ দেওয়া হচ্ছে সেখানে গিয়ে কুপন দেখালে আপনি রেশন পেয়ে যাবেন ।

ঐ কুপনের জন্য বয়স্ক বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আমাদের হাতেপায়ে ধরছেন। সেইসব দেখে আমার মনে হল একদিন জল বিস্কুট খেয়ে আমাদের তেমন কিছু কষ্ট হয় নি। ঠাকুরের এই 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা'র যে মন্ত্র মহারাজ শেখালেন তা আজও আমার মনের গভীরে দাগ কেটে রয়েছে। যখন কিছু উদ্বৃত্ত রোজগার হয় আমি আমার সাধ্যমত বেলুড়মঠে রিলিফ ফাণ্ডে পাঠাই। যাতে আশ্রয়হীন নিরন্ন মানুষ কিছুটা সাহায্য পায়।

এই খরার সময় ফুড ফর ওয়ার্ক নামে সরকার থেকে প্রকল্প চালু হয়। এই প্রকল্পে পুকুর খনন করে পরিষ্কার করা এবং গ্রামের রাস্তাঘাট তৈরি ইত্যাদি কাজ শুরু হলো। এই প্রকল্পের কাজে একটা পুকুর খুঁড়ে প্রাচীন পাথরের তৈরি বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া যায়।গ্রামের লোকজন পুকুরের পাড়ে গাছের তলায় রেখে পুজো ইত্যাদি আরম্ভ করেছে । প্রচুর গ্রামের মানুষ আসতে শুরু করে । আমাদের শ্রদ্ধেয় শিল্প শিক্ষক রামানন্দ দা এই খবর পেয়ে হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ কে বললেন কিছু করার জন্য। তা না হলে ঐ মূর্তি চুরি হয়ে যাবে । মহারাজ গাড়ি নিয়ে বললেন আজি সন্ধ্যাবেলায় লোকজন নিয়ে মূর্তিটিকে নিয়ে আসতে। সেইমতো মূর্তি মিশনে এল।

পরদিন সকালে আমরা সারদা মন্দিরে স্টাডিতে বসেছি সেই সময় দেখছি গ্রামের প্রচুর মানুষ তীর ধনুক রাখি বল্লম ইত্যাদি নিয়ে বিদ্যাপীঠের মেন গেটে চেঁচামেচি করছে তারা তাদের মূর্তি ফেরত নিয়ে যেতে এসেছে । একজন চৌকিদার এসে সেই খবর মহারাজকে দিল। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গেলেন গিয়ে চৌকিদারকে গেট খুলে দিতে বললেন সব লোকজন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে মহারাজের কাছে এসে চিৎকার চেঁচামেচি করতে আরম্ভ করলো। মহারাজ তাদের শান্ত হতে বললেন তারপর তাদের কি বললেন বা বোঝালেন জানিনা, তারপরে দেখলাম মহারাজ আসছেন আর পিছনে পিছনে ওই লোক গুলো আসছে আমাদের সারদা মন্দিরের নিচের তলায় আগেই একটা মিউজিয়াম মহারাজ করেছিলেন। সেখানে কিছু প্রাচীন শিল্প কর্ম সংগ্রহ করে রাখা আছে। পুকুর পাড়ের মূর্তি ও সেখানে রাখা হয়েছিল। মহারাজ দরজা খুলিয়ে তাদেরকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন।

তারপর একটু পরে দেখি ওই সমস্ত উত্তেজিত লোকজন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মহারাজকে ঢিপ ঢিপ করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। মূর্তি চুরির হাত থেকে বাঁচল, সংগৃহীত হলো সংগ্রহশালায়। এইরকম একজন বড় মাপের মানুষ ছিলেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ জী মহারাজ। আজ মহারাজ নেই। তিনি দেহ রেখেছেন কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমার মনে এখনও অমলিন হয়ে আছে। আজ তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলাম।

নন্দ দুলাল মুখোপাধ্যায়

অচেনা হেডমাস্টার মহারাজ

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠকে আমি তো কিছুই দিতে পারিনি। কিইবা ক্ষমতা আছে, আমার মত একজন অকৃতি-অধমের, বিদ্যাপীঠের মতন মহীরুহকে দেওয়ার! বিদ্যাপীঠ, বিদ্যাপীঠ। সে বোধ হয় পৃথিবীকে শুধু দিতেই এসেছে। তাকে দেওয়ার, বা তার ঋণ শোধ করার ক্ষমতা কারুর নেই।

কত হাজার হাজার কৃতী ছাত্র বেরিয়েছে বিদ্যাপীঠ থেকে! কত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, প্রশাসক, আরো কত মানুষ এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে, সারা পৃথিবীতে অর্থ, সম্মান, যশ পেয়েছে। তাদের মধ্যে কতজন পেশাগত জীবনে বিদ্যাপীঠকে মনে রাখে, তা বোধ হয় গুণে হিসেব করা একটুও কঠিন হবে না।

বিদ্যাপীঠ জীবনের একটা ঘটনা, আমি জীবনে ভুলব না।

আমরা সবাই জানি, সন্যাসীরা পরিবার-পরিজন ছেড়ে, ঈশ্বর-সাধনা, এবং মানুষকে সেবা করার ব্রত নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু, সার্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও, তাঁরা শিশুদের কি ভাবে পরিচর্যা করেন, তার উদাহরণ অন্তত আমার সম-সাময়িক বিদ্যাপীঠের প্রাক্তনীদের ভালভাবে জানা আছে, কালিপদদা'র কৃপায়। হাসপাতালে আমরা যখন জ্বরে কাতরাতাম, তখন তো মা-বাবাকে কাছে পেতাম না ! মাথায় হাত রেখে ঠাকুরের নাম করতেন কালিপদদা।

বিদ্যাপীঠ তখন আমি ক্লাস নাইন, কি টেন-এ পড়ি। পরের দিন থেকে পূজোর ছুটি শুরু হবে।

প্রত্যেক ছাত্র আনন্দে আত্মহারা পরের দিন সবাই বাড়ী যাব – তারপর পূজোর ছুটি। রাতে খাবার ঘরে, ভাল মন্দ খাবার খেয়ে, ধামে ফিরে, হঠাৎ ঠিক হল, ধামের সিঁড়ির কাছে একটা জলসা হবে। বেড কভার পেতে, জায়গা ঠিক হল। আমাদের ধামের একতলায় শেষ ঘরে থাকতেন হেডমাস্টার মহারাজ। দু-একজন গিয়ে মহারাজকে অনুরোধ করল আসার জন্য। উনি রাজী হয়ে চলে এলেন। সবাই খুব খুশী, মহারাজ ও খুশী। অনেক গান, কবিতা ইত্যাদি হল, তারপর মহারাজ চলে গেলেন, ছেলেরাও যে যার ঘরে চলে গেল। আমার ঘরটা ছিল, একদম সিঁড়ির পাশেই। অনুষ্ঠানের পর, তিন চারজন আমার ঘরে গল্প করে, চলে গেল। আমার বেডিং বাঁধা হয়ে গিয়েছিল, কারণ, পরের দিন সকালে, আমার বাবা এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। আমি বন্ধুদের সাথে গল্প করতে করতে, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, মনে নেই। অন্যরা ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাতে মহারাজ কোনো কারণে বাইরে বেরিয়ে, ঘরে আলো দেখে, এসে দেখেন, আমি বেডিংএ মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছি। আমাকে ডেকে তুলে, উনি বেডিং খুলে, মশারী টানাতে শুরু করলেন। আমি তো লজ্জা, আর ভয়ে, কি করব ভেবে পাচ্ছি না। আমার, বাকী রাত ঘুম হল না এই ভেবে, যে, পরের দিন বাবা এলে, মহারাজ বাবাকে বলে দেবেন। সকালে বাবা এলেন। গাড়িতে ওঠার আগে, বাবা মহারাজের কাছে নিয়ে গেলেন প্রণাম করার জন্য। আমি প্রণাম করলাম, মহারাজ আমার মাথায় হাত রাখলেন। আগের রাতের কোনো কথাই উচ্চারণ করলেন না।

এই রকম সন্ন্যাসী বোধ হয় রামকৃষ্ণ মিশনেই থাকেন। তাই তো, এঁরা আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তলে জায়গা করে নেন।

এখনো, সময়ে-অসময়ে, মহারাজের সাথে দেখা করতে যাই।

জয়ন্তকুমার ভট্টাচার্য্য।

মন গভীরে আছে যা থাক

বিদ্যাপীঠের কথা
বিশেষ কিছুই মনে নেই
তবুও আবছা কিছু মনে পড়ে।

সেই কোনো এক সন্ধ্যা, ১৯৬৪ সাল
মায়ের আঁচলে মুখ লোকানো
চোখ ভিজে শুকনো গলা
পরের দিন সকাল
নতুন জগত নতুন পথ চলা।

খুব ভোরে উঠে মশারী খোলা
বিছানা তোলা
সকালের প্রার্থনা, সাদা পোষাকে
ব্যারেট ক্যাপ, সবূজ স্কার্ফ, ড্রিল,
লেজিম ক্লাবস লাঠি পিটি কদমতাল
সুভাষ প্রতাপ শিবাজী .....কত প্ল্যাটুন,
সবকিছুই একটা থ্রীল।

ঘন্টা শুনে ওঠা, ঘন্টা শুনে খাওয়া
ঘন্টা শুনে স্কুলে যাওয়া
নীল জামা সাদা প্যান্ট
আর ব্রাউন জুতো
টিফিনে বানরুটি
বুধবার হাফ ছুটি
শনিবার শেষে
পেরুমলদার মূল্যবান অঙ্ক ক্লাস।

ধুতি পাঞ্জাবি পড়ে সন্ধ্যার ভজন
তুলসীদার কাছে তবলা শেখা
সব্যসাচীদার কাছে রবিঠাকুরের গান
রামদার চিমটি খাওয়া
আপেল আঁকতে এঁকে ফেলি আম।

মনখারাপে রেললাইনের দিকে
উদাস তাকিয়ে থাকা
দুপুরে বাড়ির চিঠির অপেক্ষা
বিকেলে সর্দার বীরসিং দার হকির যাদু শেখা
বৃষ্টিভেজা মাঠে ফুটবলের পরীক্ষা।

কত আবছা কথা ভীড় করে আসে
লিখতে আর আঙুল সরে না
মন ভারী হয়ে আসে
ঐ দিন গুলি ছিল বড় সুন্দর
ওখানে গেলে
আমি ফিরব না ফেরা যায় না।

শুভময় গঙ্গোপাধ্যায়

Predicting climate: the legacy of Basab

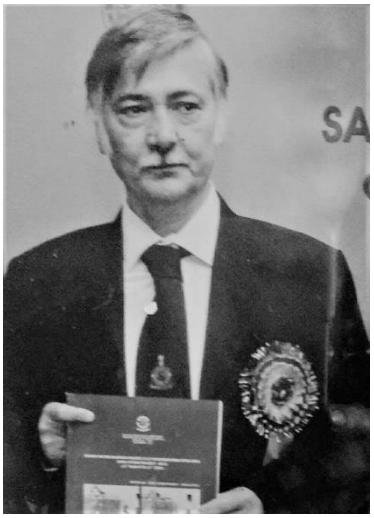

It was 1967, we were about to start a new school year of class VIII, a new student joined us. A remarkably fair-skinned boy, even with hair that was not as dark as ours. With his short stature and thin figure, he definitely was a *Gouro Borno* boy from a Brahmin family resident of Gazipur village in Agradwip, District Burdwan. He was *Basab Kumar Bandyopadhyay*.

Over next few years, he shared the dormitory rooms with Sajal, Jay Narayan, Debaki and Subir and did well in his studies and games. He chose Science stream and showed special aptitude for Mathematics, Physics and Mechanics. He was never boisterous, always measured his words, listened carefully and always volunteered for collective tasks.

After leaving school, he joined IIT Kharagpur to study Physics. During his years at IIT, he was a resident of Nehru Hall, and so was Debaki. Debaki recalls that he grew up to be a polite gentleman, did well academically and socially, and had a good student life during his Bachelor and Master's in IIT.

His academic track record helped him to find a research position with Indian Meteorological Department, Pune. Our friend, Suranjan was also there. Suranjan recalls that at Pune, Basab started his career in the field of Climate Science.

Later on, Suranjan met him in Delhi, located at the Central office of IMD, when he was the Deputy Director General for Meteorological Services. When enquired, if he was concerned that someone may demand him for the wrong climate predictions, he mentioned that there was a Minister who was scared to fly, and will call him before the flights to know about the weather on his route. And he worried that if the predictions were wrong, he may reclaim or get him fired.

During his extremely productive career, he went on to specialise in Cyclone forecasting which was always his first love. He travelled abroad widely and pioneered international and national research on cyclone warning systems.

He brought together diverse techniques to improve Cyclone forecasting. He explored satellite data, oceanographic data, local climate data, and on-ground knowledge to generate forecasting via innovative modelling, which was then transmitted to common folks, especially those in the coastal communities. He was the pioneering researcher for the forecasting of cyclone Feni, and his work helped save lives of lakhs of people.

He was never complacent about his work. A huge part of his career was devoted to critical evaluation of forecasts and their validity. He never stopped developing new ideas to meet the challenges posed by cyclone forecasting, in spite of all the uncertainties associated with the theme.

His sudden departure in 2017, was proof of the fragility of our lives. He leaves behind his wife Alakananda, his daughter Devlina who works as a senior executive at Axiom US, and son Debadeep who works as a research analyst for Google London.

His wife recalls that he was a quiet person with an easy-going personality that made everyone comfortable. He had that mischievous smile but never indulged in mischiefs. And he loved his dog.

His legacy rests in his rigor of science and his foresight. He will be celebrated for his strong foot prints on the path of Cyclone forecasting. We will remember him as our quiet friend who became a giant in the field of Climate science.

Photo journey of Vidyapith

Malay Basu Ray

The entrance

Auditorium where multi-skill developed

Landscape gelling of Nature, Bird and Building.

Development of appreciation for animals

Starting point of Mind and Self control

Camaraderie development through hostel life

Be nearer to heaven through sports

Senior school building- So many tales

Education thorugh arts

Manifesting our perfection

Mentor to innumerable students.

The paintings

Page number	Miniature	Credentials of the paitnting
Cover page		Artist: Nanda Dulal Mukherjee Untitled Year: 2021 Medium: Tempera paint on hand made Nepalese paper Curated at: Artist´s own collection
Page 8	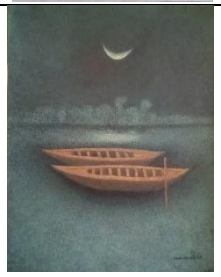	Artist: Nanda Dulal Mukherjee Untitled Year: 2020 Medium: Tempera paint on hand made Nepalese paper Curated at: Artist´s own collection
Page 13		Artist: Nanda Dulal Mukherjee Untitled Year: 2021 Medium: Tempera paint on hand made Nepalese paper Curated at: Artist´s own collection
Page 20		Artist: Nanda Dulal Mukherjee Untitled Year: 2021 Medium: Tempera paint on hand made Nepalese paper Curated at: Artist´s own collection
Page 24		Artist: Pinaki Barua Name: 'Untitled, Edition – 3/8' Year: 1984 Medium: Aquatint Size: 24 x 32 cm ID:- PB-014 Curated at Galerie 88 Life in Prints

Page number	Miniature	Credentials of the paitnting
Page 25		Artisit: Pinaki Barua Name: 'Mourners, Edition - 2/6' Year: 1985 Medium: Aquatint Size: 49 x 25 cm ID:- PB-016 Curated at Galerie 88 Life in Prints
Page 26		Artisit: Pinaki Barua Name: 'Mother and Child, Edition - 1/8' Year: 1987 Medium: Aquatint 32.1 x 49 cm ID:- PB-025 Curated at Galerie 88 Life in Prints
Page 27		Artist: Pinaki Barua Name: 'Our Christs, Artist's Proof' Year: 1991 Medium: Aquatint Size: 33 x 49.5 cm ID:- PB-030 Curated at Galerie 88 Life in Prints
Page 28	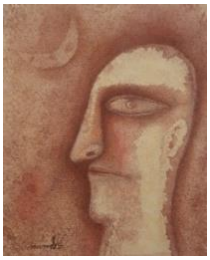	Artist: Nanda Dulal Mukherjee Untitled Year: 2020 Medium: Tempera paint on hand made Nepalese paper Curated at: Artist´s own collection
Page 35		Artist: Jayanta Kumar Bhattacharya Name: Food of love Year: 1972 Medium: Water colour on cotton pulp paper Style: Santiniketan school Size: 9 in x 4.5 in Curated at: Artist´s own studio

Page number	Miniature	Credentials of the paitnting
Page 38	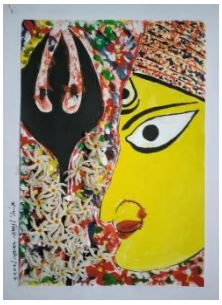	Artist: Jayanta Kumar Bhattacharya Name: Mother Goddesss Year: 2021 Medium: Water colour and natural flowers Style: Collage on paper Size: 10 in x 7 in Curated at: Artist´s own studio
Page 43	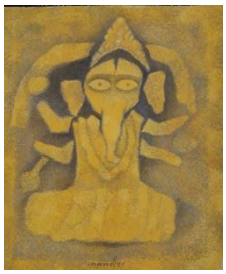	Artist: Nanda Dulal Mukherjee Untitled Year: 2021 Medium: Tempera paint on hand made Nepalese paper Curated at: Artist´s own collection
Page 51	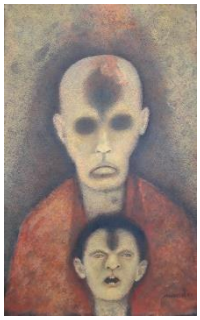	Artist: Nanda Dulal Mukherjee Untitled Year: 2020 Medium: Tempera paint on hand made Nepalese paper Curated at: Artist´s own collection
Page 57		Artist: Jayanta Kumar Bhattacharya Name: Muktamana Year: 1972 Medium: Water colour on cotton pulp paper Style: Santiniketan school Size: 8.5 in x 4.5 in Curated at: Artist´s own studio
Page 66		Artist: Manas Roy Name: Dream of Music Year: 2014 Style: Abstract expressionist – Mediterrenian cubist style. Medium: Oil on Canvas in three parts Size: 9ft x 3ft Curated at: State Museum of Oriental Art, Moscow, Russia

Page number	Miniature	Credentials of the paitnting
Page 68		Artist: Nanda Dulal Mukherjee Untitled Year: 2020 Medium: Tempera paint on hand made Nepalese paper Curated at: Artist´s own collection
Page 72		Artist: Nanda Dulal Mukherjee Untitled Year: 2021 Medium: Tempera paint on hand made Nepalese paper Curated at: Artist´s own collection
Page 75		Artist: Jayanta Kumar Bhattacharya Name: Ananda Year: 2021 Medium: Water colour on hand made Nepalese paper Size: 11 in x 15 in Curated at: Artist´s own studio

Vidyapith personalities

Page number	Miniature	Credentials
Page 18		Sri Kalipada Guha Thakurta Kalipadada Biology teacher
Page 19		Sri Sushil Roy Sushilda English teacher Hostel warden
Page 22	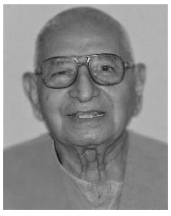	Swami Putananda Kalipada Maharaj Chief warden
Page 30		Standing from left: Chittoda, Perumalda, Bikashda, Shaktida, Subratada, Durgada, Sushil Ghosh da, Ashok da, Subhash Maharaj, Swapan da Sitting from left: Panchuda, Kestoda, Harida, Durga Mallikda, Doyamoyda, Phanida, SWAMI Hiranmayanandaji Maharaj
Page 30		Sri Chittaranjan Datta Chittada Economics teacher

Page 55		Sri Phanibhusan Khatua Phanida Bengali teacher Sri Sushil Ghose Sushilda Physical Education teacher Sri Durgasankar Mallick Durgada Chemistry teacher
Page 65	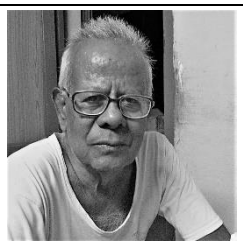	Sri S L Perumal Perumalda Mathematics teacher Hostel warden
Page 69		Swami Hironmoyananda Bara Moharaj President, RMKV Purulia
Page 71		Sri Ramananda Bandopadhaya Ramda Fine Arts teacher
Page 74		Swami Ramananda Headmaster Maharaj Headmaster, RKMV Hostel warden